কৃষ্ণ-পান্তি ।

কৃষ্ণ-পান্তি

শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ প্রণীত

কলিকাতা।
লোকনাথ কোম্পানী
১৩১৮।

[মূল্য ১৲

প্রকাশক।
শ্রীকালানাথ সিংহ
১৩, নিকাশী পাড়া লেন।

কলিকাতা
১১-১ নং নবাব্দী ওস্তাগরের লেন,
“লোকনাথ যন্ত্রে”
শ্রীভূতনাথ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"কিমুগ্যমবতাং পুংসাং দুর্লভং হি চরাচরে।
ঈশ্বরার্পিতবুদ্ধীনাং স্ফুরন্ত্যগ্রে মনোরথাঃ ॥ ৩০ ॥
দৈবং হেতুং বদন্ত্যেবং ভৃশং কাপুরুষাঃপতে।
স্বয়ং পুরাকৃতং কর্ম্ম দৈবং তচ্চ নহীতরং ॥ ৩১ ॥"

কাশীখণ্ড ৩২ অধ্যায়।

উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে ইহ সংসারে কোন্ বস্তু দুষ্প্রাপ্য? শ্রীভগবানে যাঁহারা মনোনিবেশ করেন, তাঁহাদেরও অভিলাষ ত্বরায় পূর্ণ হয়; কেবল দৈবকেই যাহারা হেতু করে, তাহারা কাপুরুষ! কারণ সেই দৈবই পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম ভিন্ন আর অধিক কিছুই নহে।

ভূমিকা।

যে সমস্ত ঘটনাবলী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত, তাহা আজিও রাণাঘাটে প্রবীণ সম্প্রদায়ের নিকট প্রসিদ্ধ। তবে তাহাদের পারম্পর্য্যের বিষয় প্রায় কাহারও জানা নাই। সুতরাং সে বিষয় এই মাত্র বলা যায় যে কৃষ্ণ-পান্তির আদর্শ চরিত্র ধ্যানে স্বভাবতঃই সেই সমস্ত ঘটনা যেরূপে গ্রথিত হওয়া সম্ভব তদ্রূপই করা হইয়াছে।

সকলেই জানেন, যে কাজে ষোল আনা মন ঢালিয়া দেওয়া না যায়, সে কাজ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মনকে বশীভূত করিয়া কোনও বিশিষ্ট বিষয়ে লাগাইয়া কার্য্য করিতে শিখিবার নামই অভ্যাস-যোগ। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অষ্টম বর্ষে বালকের মস্তিষ্কের পূর্ণ পরিস্ফুরণ আরম্ভ হইলেই, তাহাকে উপনয়ন দিয়া বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে জপ ধ্যান করিয়া মনের উপর প্রভুত্ব আনিতে শিক্ষা

দিতেন। যাহার মন যতটুকু পরিমাণে আয়ত্ত, তাহার কার্য্য-সাফল্যও ততটুকু। এই সংযমাভ্যাসে মানসিক শক্তিনিচয় প্রাখর্য্য লাভ করে ও বৃত্তিসমূহ বশীভূত হয়। সংযত মনই ঈশ্বর বা আত্মোপলব্ধির একমাত্র অধিকারী। তাই সকল ধর্ম্মেই জপ ও ধ্যানের ব্যবস্থা; এবং তাই বাল্যকাল হইতেই জপ ও ধ্যানের দ্বারা সংযমের অভ্যাস মানুষের অনুষ্ঠেয় যাবতীয় কর্ম্মে সহায়তা করিয়া থাকে। সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ষোল আনা মনে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই অবশেষে ঈশ্বরোপলব্ধি হয়। এবং সংযমী পুরুষের নিকট দৈব ও পুরুষকার অপ্রভেদ বলিয়া, তিনি ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এবং সেই জন্যই আমাদের সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যারম্ভে দেবার্চ্চনার বিধি আছে। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপান্তির জপ ও ধ্যানে নিষ্ঠা ছিল। জীবন-সংগ্রামের দুর্জ্জয় ঘোর স্রোতে পড়িয়াও একদিনের তরেও তিনি ঐ নিত্য

নৈমিত্তিক কাজটী অবহেলা করেন নাই। তাই তাঁহার মনের বল চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবার প্রারম্ভ হইতেই, কৌশল, যুক্তি, দূর-দৃষ্টি, লোকের মনোভাব বুঝিয়া তাহার সহিত উপযুক্ত কথোপকথন এবং নিজের বুদ্ধির উপর প্রগাঢ় আস্থা তাঁহার সকল কর্ম্মে এমন সহায়তা করিয়াছিল যে তৎকালিন তাহা সাধারণের চক্ষে অতি আশ্চর্য্যের ব্যাপার হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে ঐরূপ জপধ্যানটাই তাঁহার পুরুষকার যাহা ইতর লোকের দৈব। "অহমস্মি পৌরুষং নৃণাং," —গীতা।

ইতি

শ্রীগ্রন্থকার

বিক্রয় করিতে আসে। সমস্ত দিনে পানগুলি বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহাতে এক সপ্তাহের সংসারখরচের মত চাল ডাল প্রভৃতি ক্রয় করে। যদি কিছু পয়সা উদ্বৃত্ত হয়, তাহাতে পুত্রদের জন্য মুড়ির মোয়া কিনিয়া সন্ধ্যার পরশ্বাটী প্রত্যাগমন করে। পিতা যে দিন মোয়া আনেন, কৃষ্ণ পাল্কি দৌড়িয়া পল্লীর সমস্ত খেলুড়ে ছেলেদের ডাকিয়া আনে এবং তাহাদের সহিত নিজের অংশের মোয়া-গুলি ভাগ করিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করে।

একদিন কৃষ্ণ পিতার নিকট আব্দার করিয়া বলিল, 'বাবা মুই হাটে যাব ; মোরে একটা পানের বোঝা কোরে দাও, মুইও মাথায় কোরে নিয়ে গে পান বিক্রী কর্‌ব।' কাজেই সহস্ররাম পানের একটী ছোট বোঝা বাঁধিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাথায় তুলিয়া দিল। কৃষ্ণ সেটী মাথায় লইয়া ছোট ভাই শম্ভুর হাত ধরিয়া হাটে গেল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ নিধিরাম জন্ম অবধি অক্ষম, সে কোথাও যায় না। পিতা হাটে যাইয়াই ছেলেদের কিছু জলযোগ করাইল এবং নিজেও কিছু খাইল। পরে একস্থানে বসিয়া পান বিক্রয় করিতে লাগিল। কৃষ্ণ কিছুক্ষণ পিতার সঙ্গে

ক্রেতাদের জন্য পান বাঁধিয়া দিল; তাহার পর হাটের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া ও সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইল। একজন ব্রাহ্মণের বাটী হাটের নিকট; তিনি প্রতি হাটে সংসার খরচের জিনিষ পত্র ক্রয় করেন। তিনি পান কিনিতে সহস্ররামের কাছে গেলে কৃষ্ণ তাঁহার পানগুলি অতি যত্নের সহিত বাঁধিয়া ফাউ হিসাবে গুটিকতক পান বেশী দিল। ব্রাহ্মণের মন কৃষ্ণের প্রতি স্নেহার্দ্র হইল। ব্রাহ্মণ জিনিষ পত্র মোট বাঁধিয়া কতক তাঁহার এক প্রজার মাথায় তুলিয়া দিলেন এবং কতক নিজেই বগলে ও হাতে করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন। বালক কৃষ্ণপান্তি তাড়াতাড়ি,'মোশায় মোরে একটা দেও, মুই তোমার ঘরে পৌঁছে দিই', বলিয়া ব্রাহ্মণের হাত হইতে একটা মোট লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ছেলেটির প্রতি ব্রাহ্মণের বড়ই মমতা জন্মিল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন বাটী গিয়া বালকটিকে দুই একটি পয়সা দিবেন। বাটী যাইয়া মোট নামাইয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে একটি পয়সা দিতে উদ্যত হইলেন, বলিলেন—'বাবা এই নে মুড়ি কিনে খেগে।'

কৃষ্ণ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া দৌড় দিল, বলিল, 'পয়সা কি হবে।'

ব্রাহ্মণ স্নেহের তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'আরে পালাসনি দাঁড়া।'

অমনি কৃষ্ণ শান্ত হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কিছুতেই পয়সা লইল না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তবে দুটী ভাত খেয়ে যা।"

'আচ্ছা, তা হবে এখন', এই বলিয়া কৃষ্ণ আবার দৌড়িল। ব্রাহ্মণ পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ওরে ছেলেটা পালাস্ কেন? শোন্, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

কৃষ্ণ আবার থামিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আচ্ছা পাস্তির পো, তোরা ত এসেছিস রাণাঘাট থেকে; ভাতটাত কিছু খেয়ে বেরিয়েছিলি কি?'

কৃষ্ণের মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, বেলা আটটা নয়টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, ছেলে মানুষ, তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে। সে উত্তর করিল, 'মোবা ঘরকে গিয়ে ভাত খাব।' ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া শীঘ্র ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কৃষ্ণকে পান্তা ভাত

খাওয়াইতে বলিলেন। কৃষ্ণ কিছুতেই তাহা খাইল না, তাহার পিতার কাছে পলাইয়া গেল, বলিয়া গেল, 'খাব এখুন, হাট ভাঙ্‌লে খেয়ে যাব।' ব্রাহ্মণ দেখিলেন, পিতা পুত্র তিন জনের ভাত কুলাইবে না। তজ্জন্য পুনরায় হাটে যাইয়া, কিছু মুড়ির মোয়া কিনিয়া আনিলেন, এবং সহস্ররামকে বলিয়া আসিলেন, 'অ পান্তি খুড়ো, তোমরা তিন বাপ পোয়ে যাবার সময় আমার ওখানে পেসাদ পেয়ে যেও। তোমার ব্যাটাকে বামুনি পান্তা ভাত দিতে গেল, সে ছোঁড়া পালিয়ে এল। তোমার ছেলের বুঝি লজ্জা হল। তা খুড়ো তুমি যাবার আগে এস, ছেলের মুখের ভাত ফেলে যেতে নেই।'

সহস্ররামেরও অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে বলিল, 'তা বেশ বাবা ঠাকুর, ছোঁড়াদের নিয়ে যাব এখুন।' হাট ভাঙ্গিলে কৃষ্ণ পান্তিরা তিন জনে ব্রাহ্মণ গৃহে যাওয়া মাত্র ব্রাহ্মণী সযত্নে তিন খানি পাতায় ভাত, ডাঁটা চচ্চড়ি, মৌরলা মৎস্যের অম্বল, কয়েকটী মুড়ির মোয়া, কাগজী লেবু, একটু দই এবং উত্তম আখের গুড় দিলেন। পান্তিরা পেট ভরিয়া ভাত খাইল। খাওয়া হইলে কৃষ্ণ

সকলের পাতা কুড়াইয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তিন জনের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিল। তৎপরে পিতার সহিত ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় ব্রাহ্মণ বলিয়া দিলেন, "পাস্তি কাকা! এক কাজ কোরো, হাট থেকে যাবার আগে যে দিন ছেলেদের আন্‌বে এখান থেকে পেসাদ পেয়ে যেও। তিন তিন কোশ পথ যেতে হয় আর আমার এখানে ভাতের অভাব নেই। তা খুড়ো ঐ কথা রইল, হাট-বাবে এখানে তোরা তিন বাপ পোয়ে খেয়ে যাবি, কেমন?"

বৃদ্ধ পাস্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা তুমি যখন বড় মুখ কোরে বলছ, তা তাই হবে।" এই বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া তিন জনে চলিতে আরম্ভ করিল। সেদিন কৃষ্ণ গ্রামে প্রবেশ মাত্র চীৎকার করিয়া খেলার সাথীদিগকে আহ্বান করিল। সকলেই উপস্থিত হইলে মোয়ার পুঁটুলি লইয়া দাওয়ায় বসিয়া সকলকেই খাওয়াইল, নিজেরা কিছু খাইল না। একটী বালক বলিল, "তোরা খাবিনি ভাই?" কৃষ্ণ উত্তর করিল, "আজ ভাই

হাটের নিকট এক বামুন ঠাকুরের বাড়ী মোরা খুব পেসাদ পেয়ে এসেছি। আর পেটে ধর্‌বে না, ভাই তোরা খা।” পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে হাটে যাইত, এবং উক্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে পান্তা ভাত খাইয়া আসিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিছুকাল পরে কৃষ্ণ একটু উপযুক্ত হইলে, সহস্র-রামের মৃত্যু হইল। পিতার মৃত্যুর পরে কৃষ্ণেরা দুই ভ্রাতা পান বিক্রয় করিতে গাংনাপুর যাইতে লাগিল। ক্রমে সংসারের পোষ্যবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষ্ণ একটী মাত্র হাটে আবদ্ধ না থাকিয়া নিকটবর্ত্তী আরও পাঁচ সাতটি হাটে পান এবং অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিল। প্রতিদিন তিন চার ক্রোশের মধ্যে একটী না একটী হাট হয়। কৃষ্ণপান্তি সপ্তাহে প্রায় সাতটী হাটে পান, ছোলা, মটর, গম, যব, সরিষা, ধন্চে কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু কিছুতেই এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে না। পিতার

মৃত্যুর পর কৃষ্ণ একখানি মাত্র ঘর বাড়াইয়াছে, তাহাও অতি কষ্টে। ছোট ভাইদের বিবাহ হইয়াছে, আর একটি ঘর না হইলে চলে না। কৃষ্ণদের এখন সর্ব্বশুদ্ধ চারি খানি ঘর, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্বের অভাব নাই। কেহ উপস্থিত হইলে পুরুষেরা একত্রে বারাণ্ডায় এবং স্ত্রীলোকেরা ঘরের মধ্যে শয়ন করে। অত্যন্ত বৃষ্টির সময় দাওয়ায় কেবল মাত্র দরমার আড়াল দেওয়া হয়। কৃষ্ণ পান্তির বাটীতে আসিলে কুটুম্বেরা যাইতে চাহেন না; বলেন, এমন যত্ন কোথাও হয় না। পান্তিদের এত অনাটনের ভিতরও কেমন সুশৃঙ্খলা! গৃহের সর্ব্বত্রই অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আত্মীয়গণ নিজ নিজ সংসার হইতে এখানে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। এইরূপে জীবনের ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেল, কৃষ্ণ পান্তির দুর্দ্দশা ঘুচিল না।

তৃতীয় অধ্যায়।

একদিন চূর্ণিতে স্নান করিতে গিয়া কৃষ্ণ দেখিল, একজন ব্রাহ্মণ স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া নিমীলিত-নেত্রে জপ কবিতেছেন। কৃষ্ণপান্তি কিছু দূরে স্নান করিতে লাগিল। স্নানান্তে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া তীরে উঠিয়া দেখিল একটি পুঁটুলি পড়িয়া আছে। পান্তি ভাবিল, "এ সেই বামুনের জিনিষ, তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে।" সেটী তুলিয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ব্রাহ্মণকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, "পুঁটুলির জন্য বামুন নিচ্চয় এখানে আস্‌বে। মুই এইখানেই বসে থাকি।"

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত, কৃষ্ণপান্তি পুঁটুলি লইয়া সেই স্থানে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। পুঁটুলিটি ছোট হইলেও ভারী, খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে দেড়শত টাকা, কয়েক খানি রূপার গহনা, আর দুই একখানি নূতন কাপড়। "বামুন নিচ্চয় তার মেয়ের বিয়ের জন্যে এগুলি ভিক্ষে কোরে এনেছে; পুঁটুলির জন্যে এখুনি আস্‌বে। মুই এইখানেই বসে

থাকি।” পাস্তি এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে কে বলিল, “দাদা, বেলা হয়েছে, ঘর যাবে না, ভাত খাবে না?” পান্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, “ওরে শোম্ভ, একটু দরকার আছে, এখন যাব না, তুই মোর ভাতটা নিয়ে আয়, এইখানেই দুটি খেয়ে নি।” কৃষ্ণপাস্তির মৃত্যু কালেও কথার জড়তা দূর হয় নাই, শম্ভুর পরিবর্ত্তে শোম্ভ, রাজার পরিবর্ত্তে আজা, এবং কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে ‘কেষ্টপাস্তি’ বলিত। কৃষ্ণচন্দ্র পাল কি পাল চৌধুরী বলিতে লজ্জা হইত। শম্ভু ভাত আনিতে গেল; কৃষ্ণ পুঁটুলিটা গামছায় ঢাকিয়া রাখিল। বাটী নিকটেই; শম্ভু ভাত আনিয়া জ্যেষ্ঠের সম্মুখে জল ছিটাইয়া ভাতের পাথরখানি রাখিল। পান্তির আহার হইলে পাথরখানি চূর্ণিতে ধুইয়া লইয়া গেল। যত সময় যাইতেছে, পান্তি ততই আশ্চর্য্য হইতেছে, যে ব্রাহ্মণের এখনও পুঁটুলির কথা মনে পড়িল না। পান্তি ভাবিতেছে ঠিকানা জানা থাকিলে দৌড়াইয়া ব্রাহ্মণের হস্তে পুঁটুলি দিয়া নিষ্কৃতি পাইত। আবার মনে করিতেছে, “যে পুঁটুলিতে বামুনের জাত মান রক্ষে হবে তা যে

কেমন কোরে ভুল্লে ? হয়ত কালই মেয়ের বিয়ে। হে ভগবান! বেচারাকে আর কষ্ট দিও না, পুঁটুলির কথা তাকে স্মরণ কোরে দাও।"

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, কৃষ্ণপান্তি নির্জ্জনে প্রশান্ত অন্তরে অনেকক্ষণ জপের পর উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল, সময় কাটে না, মধ্যে মধ্যে নিদ্রা আসিতেছে। নিদ্রিত হইলে পাছে পুঁটুলি অপহৃত হয়, সেই জন্য কখন বা পদচারণা, কখন বা বসিয়া, সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কেবল ঝিল্লীর ঝিম্ ঝিম্ রব, যেন সুপ্ত প্রকৃতির প্রাণ ধক্‌ধকানির শব্দ। মধ্যে মধ্যে পেচকের কর্কশ কণ্ঠ ও প্রহরে প্রহরে শিবা-রব সেই সুপ্ত প্রকৃতির চমক ভাঙ্গাইতেছে। ঝিল্লীর মাদক রবে একবার মাত্র শ্রান্ত কৃষ্ণপান্তির তন্দ্রাকর্ষণ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শিবারবে জাগ্রত হইলে তাহার মনে হইল যেন দূরে অন্ধকার ভেদিয়া কে আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ দৃষ্টির পর পান্তি অগ্রসর হইয়া দেখিল, বোধ হইল যেন সেই ব্রাহ্মণ। "আঃ বাঁচ্‌লাম বামুন আস্‌ছে" এই

ভাবিয়া আরও অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি ঠাকুর এত রাত্রে এখানে কেন?"

ব্রাহ্মণ ব্যগ্র-ভাবে বলিলেন, "আর বাবা আমার সব্বনাশ হয়েছে, টাকার পুঁটুলিটা ফেলে গেছি। আমার নাইবার সময় একটা কেলে ভূত মত লোক নাইতে নেবে ছিল।" এই বলিয়া ইতস্ততঃ নদীতটে অন্বেষণের পর আবার বলিলেন, "নাঃ! সেকি আর পাওয়া যায়, সে সেই কেলে ভূত-টাই নিয়ে গেছে।"

পান্তি ব্রাহ্মণের ব্যগ্রতা দেখিয়া একটু বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি নিয়ে গেছে ঠাকুর, তুমি কি খুঁজছ?"

ব্রাহ্মণ শিরে করাঘাত করিয়া হতাশ স্বরে বলিলেন, "আর বাবা, আমার মাথা আর মুণ্ডু। সেই টাকার পুঁট্‌লিটা সেই লোকটাই নিয়েছে।"

কৃষ্ণপান্তি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উত্তর করিল, "ও ঠাকুর সেই কেলে ভূতটাই মুই, আর এই সেই টাকার পুঁট্‌লি। এতে কি কি আছে যদি বল্‌তে পার, ত বুঝ্‌বো সত্যি এটা তোমারি; না বল্‌তে পার, পাবে না, ঠাকুর।" পান্তি পুঁট্‌লিটা একবার

ব্রাহ্মণকে চকিতের মত দেখাইয়া পিছনে লুকাইয়া রাখিল।

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হস্ত প্রসারিয়া পন্তিকে সকাতরে বলিলেন, "আঃ আমায় বাঁচালি, বাপ্ আমার!" কিন্তু পান্তি কৈফিয়ৎ চাওয়াতে, অগত্যা ব্রাহ্মণ হাত গুটাইয়া পুঁটুলির মধ্যে যাহা ছিল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। ন্যায়বাগীশ ব্রাহ্মণের সহিত পান্তির রহস্য করিবার আশা মিটিল, অমনি পুঁটুলিটি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "এই নাও ঠাকুর পুঁটুলি খুলে সব মিলিয়ে নাও।"

ব্রাহ্মণ সব পাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুই আজ আমার যে উপকার করলি তা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। আমার জাত মান বাঁচালি, আমি আর কি বলব, যদি ভগবান থাকেন ত তিনি তোমায় অতুল ঐশ্বর্য্য দেবেন।" এই বলিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ-করনান্তর ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দ্রুত পদে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

পান্তি তাঁহার পশ্চাতে যাইতে যাইতে বলিল, "বল কি দাদা ঠাকুর! এ যে মস্ত আশীর্ব্বাদটা

কোরে ফেল্‌লে। মুই পান্তি, পান বেচে খাই, এক বেলা খাই, এক কড়া কড়িও বাঁচাতে পারি নি, মোর অতুল ইশ্বয্যি হবে কেমন কোরে ?”

ব্রাহ্মণ অতি ব্যগ্রভাবে পশ্চাৎ ফিরিয়া পান্থির প্রতি স্নেহপূর্ণ কটাক্ষ সহ উত্তর করিলেন,—“বিশ্বাস কর বাবা, ভগবান আছেন। তিনি নিশ্চয় তোমায় মহা ঐশ্বর্য্যশালী করবেন। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে বল্‌ছি, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় !” ব্রাহ্মণ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন, আর আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন, “কি আশ্চর্য্য, লোকটা পান্তি, পান বেচে খায়, একবেলা খায়, আমারই মত এক কড়া কড়ি সঞ্চয় করতে পারে না। আর এতটা টাকার লোভ সাম্‌লালে। আমি ও অবস্থায় পড়লে কি করতাম মা জগদম্বাই জানেন ! আবার পুঁটুলিটা আগ্‌লে সেই অব্দি এই অব্দি নদীর ধারে বসে আছে—আমার অপেক্ষায়। যথার্থই নির্লোভী মানুষ। লোকে বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। আমার হয়ত হত, কিন্তু এরত হয়নি! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য—এমন ধর্ম্মপরায়ণ লোক দেখি নি। মা জগদম্বা, পুঁটুলিটা না পেলে কি করতুম মা ?

মানুষটা মা তোমার নিজের লোক, তা না হলে আজকের দিনে টাকার লোভ সামলায়! তোমার কৃপার পাত্র নিশ্চয়, নইলে মুখ দিয়ে আশীর্ব্বাদটা যেন কে ঠেলে বার কোরে দিলে। সবই তোর ফের মা, এ তোরই কাজ।" ব্রাহ্মণ আপনা আপনি গদগদ স্বরে এইরূপ বলিতে বলিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পান্তি ধীর পদে গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে চিন্তা করিতেছে, "দেবতা ত বস্তু আশীর্ব্বাদটা কোরে গেল, কিন্তু মনিবার কি অদেষ্ট ছাড়া পথ আছে? এই ত দারুণ ট্যাকার টানাটানি, তাব ওপর কি না আবার দুটো বিয়ে? একটার ওপব আবার আর একটার কথা কে জান্‌ত? শাশুড়ী বোয়ে ত কত ঘরেই বনে না, কিন্তু কার মা বেটার গলাটিপে একটার ওপর আর একটা বৌ করে দেয়? কৈ মুই আবার একটা বিয়ে কর্‌ব না বোলে বুড়ীর পায়ে হাজারবার মাথা খুঁড়লাম। বুড়ীর ঘাড়ে যেন ভূত চাপ্‌ল, বল্লে কি না, 'তুই না বিয়ে করিস ত, মুই জলে ডুবে মর্‌ব!' বাবা! কি আর করি, অদেষ্টো ছাড়া গতি নেই ঠাকুর। মোর অদেষ্টে

দুটো বিয়ে ছিল, তাও আর ভেবে মুই কি করব, যে সব করেছে, সেই যা হয় করবে; মাঃ যত মুটে, ছোট আর বড়।" পান্তি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়া সুখে নিদ্রিত হইল।

কৃষ্ণপান্তির কেবল মাত্র চারখানি ঘর; কোন একটা বিশেষ ঘটনার জন্য তাহার একখানি ঠাকুর ঘরে পরিণত হইল। সুতরাং কৃষ্ণপান্তিকে দায়ে পড়িয়া আর একখানি ঘর তুলিতে হইল। কিছু ঋণও হইল। সংসারের অনাটন আরও বর্দ্ধিত হইল। সর্ব্বদাই পান্তির মনে হয়,—"সচ্ছল না হোলে কেমন কোরে সংসার ধর্ম্ম করি?" কৃষ্ণ বড়ই চিন্তা মগ্ন। এই সময়, একদিন কৃষ্ণ নিকটবর্ত্তী কোন হাটে যাইবে বলিয়া সকাল সকাল সমস্ত রন্ধন শেষ হইয়াছে; সকলে আহারে বসিতে যাইতেছে, একদল কুটুম্ব আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণ মাতাকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল,"কি হবে মা? মোদের ভাত ওঁনাদের দেও, তার পর যদি চাল থাকে ত বোয়েরা আর চাট্টি ভাতে ভাত করুক!"

মাতা উত্তর করিলেন, "তা কি হয় বাবা, তুমি হাটে যাবে, খেয়ে দেয়ে যাও। মোদের আর মান

অভিমান কি ?" এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক একটী বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, "ওদের রান্না বাড়া অনেক হয়, একটু বেলাতেও হয়। ওদের বল্‌বে, 'ভাই মোদের হাঁড়ী উঠে গেছে এমন সময় কুটুম এল। তোমরা হাঁড়িতে কিছু বেশী চাল নিও।" কৃষ্ণ মাতার পরামর্শ মত দুই ভ্রাতায় কর যোড়ে আত্মীয়দিগের নিকট অনুমতি লইয়া আহ্বান করিল, তাহার পর মোট মাথায় করিয়া হাটে গেল।

পুত্রেরা গমন করিবার পর বৃদ্ধা প্রতিবেশীদের গৃহে যাইয়া চুপি চুপি গৃহিণীকে বলিলেন, "গিন্নী মা, আজ ও গাঁয়ের হাট কি না, তাই সকাল সকাল মোদের হাঁড়ী উঠে গেছে, এমন সময় আমার বাপের বাড়ীর সবাই এসে পড়েছে।"

বৃদ্ধার কথা শেষ না হইতেই গৃহিণী ঠাকুরাণী মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন,—"তা বেশ, একবার জানতে পারলেই হোল, আমাদের ত এই মাত্তর রান্না চড়্‌ল! তারা কজন ?" বৃদ্ধা একগাল হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তিনজন মা তিনজন।"

গৃহিণী—তোমার বড় বৌকে পাঠিয়ে দিও;

তুমি আর কষ্ট কোরে এস না ; ভাত, মাছ, তরকারী আজ অনেক। সকালে ছেলেরা মাছ ধরে ছিল কিনা।

সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণ হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে বলিল, "আজ ত এক রকম চলে গেছে। মাসীরা কদিন থাক্‌বেন ?"

মা—তাহা কি সুধুতে পারি ? মনে হয় দিন কতক থাকবে।

কৃষ্ণ—তবে কি হবে মা ? এই টানাটানি।

মা—হবে আবার কি ? মাছ ত গাঁয়ের কারুর না কারুর বাড়ী রোজই ধরান হচ্ছে। তাদের একটিবার জানান যে মোদের ঘরে কুটুম এসেছে। তরি-তরকারিরও ভাবনা নেই। তুই গোটা কতক চাল না হয় ধান ধার কোরে নিয়ে আয়।

কৃষ্ণ ধার করিতে একেবারেই অসম্মত ; সেই জন্য বলিল, "এই কথাই ত মুস্কিলের কথা, শুধ্‌ব কোথা থেকে ? চাল ধান ধার পাবার ভাবনা নেই। কি করে দেনা যাবে ভেবে পেটের ভাত চাল হচ্ছে। তার ওপর আবার দেনা, এই কথাই ত বল্‌ছি।"

মা—তোর ভাব্‌তে হবে না বাবা, মুই যোগাড়

করব, আবার মুই শোধ করব এখুন। তোর আর দুঃভাবনা কোরে কাজ নেই বাবা।

বেলা দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণপান্তির বড় স্ত্রীকে তাঁহার শ্বাশুড়ী ভাত আনিতে পাঠাইলেন। জ্যেষ্ঠা বধূ ঘোমটায় মুখাবৃত্ত করিয়া প্রতিবেশীদের বাটী গেলেন। প্রতিবেশীদের গৃহিণী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "অ বৌমা, তুমি একলা এলে কেন? একলা কি সব নিয়ে যেতে পারবে?" বধূ ঘোমটার ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, পারবো।"

প্রতিবেশী গৃহিণী—তোমাদের সকলের ভাত দেব। ওবেলা আর তোমাদের হাঁড়ী চড়াবার দরকার হবে না। তুমি যাও, তোমার সতীনকে সঙ্গে করে আনোগে। আর দুখানা বোগ্‌নো এনো। একটাতে মাছের ঝোল আর একটাতে ডাল দেব।

বড় বধূ তাঁহার আদেশমত সতীনকে সঙ্গে আনিয়া দুই জনে রান্না ঘরের দাওয়ায় বসিলেন। ইতিমধ্যে কথা প্রসঙ্গে ছেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "কাল দত্তদের বড় পুকুরে মাছ ধরার বন্দোবস্ত হয়েছে।"

কৃষ্ণপান্তি সন্ধ্যার পর হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার মাতা বলিলেন যে তিনি চাউলের যোগাড় করিয়াছেন, আজ যেমন উত্তম ভাত, মাছ ও তরকারী খাওয়া গিয়াছে কালও তেমনি যেন হইবে, দত্তরা কাল মাছ ধরিবে কি না।

কৃষ্ণপান্তির সময়ে পল্লীগ্রামে যে সমস্ত প্রাণময় সামাজিক রীতি পদ্ধতি ছিল, সংসারযাত্রার তদ্রূপ উদার আচার ব্যবহার এখন বহু স্থানে আর নাই। সে সময়ে এই প্রকার ব্যবহার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত না থাকিলে হয়ত কৃষ্ণপান্তির মত দরিদ্র সংসারের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে সংশয় হইয়া দাঁড়াইত। এই জন্য সেই সময়ে পল্লীগ্রামের এক এক পল্লীর লোকেরা কেমন করিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ পল্লীর সমগ্র স্বার্থে নিমজ্জিত রাখিয়া স্ব স্ব শ্রমোৎপন্ন বস্তু পরস্পরের মধ্যে অবাধ আদান প্রদানে সমগ্র পল্লীর কতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারিত, তাহার দৃশ্য আমরা না দেখিলে কৃষ্ণপান্তির আদর্শ চরিত্র গঠনের কারণ এবং মানবচরিত্র কি সূত্রে উন্নীত হইতে পারে তাহার কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইব। বাগানের

ফল মূল তরকারী, নূতন দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ, পুষ্করিণীর মৎস্য, এ সকল দ্রব্য প্রথমে দেবতাকে তৎপর সমস্ত প্রতিবেশীদের না দিয়া গৃহস্থপক্ষে নিজে ব্যবহার করা পল্লীগ্রামে নিতান্ত দোষাবহ ছিল। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামে কাহারও দশটা কাঁচকলার আবশ্যক হইলে প্রতিবেশীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তাহার বাগান হইতে তাহা আনিয়া নিজ ব্যবহারে লাগান, হয়ত কোন কোন স্থল ব্যতীত, বহু স্থলে চুরী করা হয়। পূর্ব্বে কিন্তু তাহা হইত না। শুধু ইহাই নহে; তৎকালে কোন্ প্রতিবেশীর কি অভাব ও কোন্ বস্তুর কতটুকু অভাব, এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবের সংবাদ রাখার একটা সহৃদয় চেষ্টা ছিল; এবং সেই অভাব পূরণ করা একটা প্রাণহীন মুখস্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম না ভাবিয়া, একটা বিশেষ ভালবাসা মাখান দৈনিক কর্ম্ম বলিয়া তদনুষ্ঠানে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুতরাং সে কর্ম্মে দাতা বিপন্নের অভাব মোচনে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন, এবং গ্রহীতা দান গ্রহণে আপনাকে পতিত বা অবমানিত মনে করিতেন না। বরং ভবিষ্যতে দাতার সমতুল্য

হইয়া তদনুরূপ সামাজিক কল্যাণ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনের পবিত্র সঙ্কল্প তাঁহার প্রাণে জাগিত। কারণ সে আদান প্রদানে দাতা ও গ্রহীতা অবস্থাব ইতর বিশেষ ভালবাসার আত্মীয়বৎ ব্যবহারে পরিলক্ষিতই হইত না। ফলে দাতা আজ অন্ন দিয়া অমুকের প্রাণ বাঁচাইলাম ভাবিতেন না। আপনার ছেলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে খাওয়াইয়া কে ভাবে, আমি আজ অন্নদানে তাহাদেব প্রাণ বাঁচাইলাম? এক পল্লীর যাবতীয় লোক যেন একটী পরিবার ভুক্ত, এমনই ভাবে তাহাদের সৌহার্দ্দ্যপ্রীত জীবন কাটিত; এমন কি বর্ণগত প্রভেদ ঐ খুড়, জ্যাঠা, দাদা, দিদি, মাসী, পিসী প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধে সুখাবৃত থাকিত। একজন হয়ত নিজ পুষ্করিণী হইতে অনেক মাছ ধরাইয়া পল্লীস্থ সকল গৃহস্থের বাড়ী বিতরণ করিলেন। কিন্তু এমন অনেক গৃহস্থ আছেন যাঁহাব সেই মাছগুলি ভাজিতে যেটুকু তৈল আবশ্যক তাহা ক্রয় করিবার সঙ্গতি নাই। এই ক্ষুদ্র অসঙ্গতিব সংবাদ আজি কয়জনে রাখেন? এখন এ প্রকার প্রকৃতি বড় বিরল। সুতরাং পল্লী-জীবন-ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিবিধ রসপানে দরিদ্র কৃষ্ণপাস্তির জীবন পরিপুষ্ট

হইয়াছিল, যাহার ফলে, কমলার কৃপার দিনে, তাঁহার দান ও প্রেম একটি বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীনতা লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে এক আদটীর একটু আস্বাদ না লইলে এ আখ্যায়িকা-রসপান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই হেতু তাৎকালিক পল্লী-জীবন-ক্ষেত্রের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

পরদিন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে এক দল বালক হৈ হৈ রবে দত্তদের বড় পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত; সাত আট জন দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ ধীবর টানা জাল, ক্ষেপলা, চাবিজাল, বড় বড় হাঁড়ি ও বাঁশ স্কন্ধে লইয়া উপস্থিত। বোঝাগুলি নামাইয়া ধীবরেরা কেহ তামাক সাজিতে, আর কয়েক জন মিলিয়া খণ্ড খণ্ড জালগুলি জুড়িয়া পুষ্করিণীর আয়তন মত লম্বা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কেহ বা জালগুলি সংযোজিত করিয়া, কেহ বা কলাগাছ কাটিয়া ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া মাছ ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু কর্ত্তা এখনও আসেন নাই। তাই তাহারা বসিয়া একটু তামাক খাইতেছে। ছেলেদের কিন্তু আর বিলম্ব সহে না। তাহারা মালাদের বিরক্ত করিয়া তুলিল, বলিল,

"তোরা এখুনি যা, জলে নাম, মাছ ধরতে আরম্ভ কর, কর্ত্তা এলেন বলে।"

মালারা বলিল, "না ভাই, তা কি হয়? দাদা মোশায় হাজির না থাক্‌লে মোরা জলে নাম্‌তে পারি না তিনি দাঁড়িয়ে হুকুম দেবে, তবে নাম্‌বো। নইলে যদি বলে,—'তোরা আমার আড়ালে মাছ ধরে পাচার করিচিস্‌'।"

দত্ত বাড়ীর নাতীরা—আরে দাদু তা বলবেন না। আমরা রইচি যে, তা কেন বল্‌বেন?

মালারা—আরে ভাই যদি মাচ্‌ চুরি করি, তোমরা কি সাম্‌লাতে পার? তোমরা কচি ছেলে।

ছেলেরা—আমরা পারব না, দাদু একলা পারবেন?

মালারা—দাদু পাকা লোক; তাঁর চোক এড়ান মালার সাধ্যি নেই। মোরা জলের ভেতর মাছের ঘাড় মোট্‌কে পেট-কাপড়ে এমন রাখ্‌ব যে তোমরা ধরতে পারবে না: আর দাদু বুড়ো জলের ভেতর মোদের হাত নাড়া দেখে বুঝতে পাবে মাছ চুরি করেছি কি না।

ইতিমধ্যে কর্ত্তা খড়ম পায়ে ছাতা হাতে উপস্থিত

হইলেন। অমনি বালকমণ্ডলীতে মহা আনন্দ পড়িয়া গেল। তৎপল্লীস্থ এবং চতুপার্শ্বস্থ পল্লীর অনেক লোক মাছ ধরা দেখিবার জন্য তথায় আসিল।

জেলেরা একবার টানা দিয়া জাল তুলিল। আট দশটা বড় বড় রুই কাৎলা মির্গেল ও তৎসঙ্গে ছোট ছোট অনেক মাছ উঠিল। জাল টানা দিয়া ডাঙ্গায় তুলিবার পর, মাছ যত ধড়ফড় করিয়া লাফায়, বালকদেরও আনন্দে তত নৃত্য, কিন্তু বৃদ্ধদের মানসিক নৃত্য বাহিরে অপ্রকাশিত রহিল। এইরূপে তিন চারি বার টানা দিবার পর প্রায় সাত আট মণ মৎস্য সংগ্রহ হইল। ছোট ছোট মাছগুলি পুনর্বার জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। জেলেরা পারিশ্রমিক হিসাবে এই সমস্ত মৎস্যের এক চতুর্থাংশ পায়, প্রত্যেক প্রতিবেশীরই প্রাপ্য আছে; সুতরাং পল্লীস্থ সকলেই মহা আনন্দিত। তাই কাহারও বাড়ী মাছ ধরা হইলে, একটা পল্লীর সমস্ত লোকের যেরূপ আনন্দ হয় এরূপ অন্য কোন কাজেই হয় না।

মাছগুলি দত্তদের বহির্বাটীতে আনা হইল। মালারা অন্তঃপুর হইতে বড় বড় বঁটী আনিয়া মাছ

কুটিতে বসিল। কর্ত্তা বলিলেন,—"হ্যাঁরে মোড়লের পোয়েরা, জামাই বাড়ী তত্ত্ব পাঠাতে হবে, দুটো বড় বড় মাছ আস্ত রাখিস। বাকীগুলো বড় বড় দাগা কোরে কুটে ফেল।"

সর্ব্বশুদ্ধ দেড় মণ দুইটি মৎস্য তৎক্ষণাৎ জামাই বাড়ী প্রেরিত হইল। পল্লীর প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক অংশ হইল। মালাবা প্রথমেই কর্ত্তার অনুমতিক্রমে স্ব স্ব প্রাপ্য মাছ লইয়া অন্য লোকের সাহায্যে সে গুলি নিকটবর্ত্তী বড় বড় গ্রামে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছে। মাছগুলি কুটিয়া ভাগ করিতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। তৎপর পল্লীর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের হস্তে প্রত্যেকের অংশ দেওয়া হইল। আর যাঁহারা কার্য্য গতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, দত্ত নাতীরা স্বহস্তে তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটী মাছ দিয়া আসিল। একজন অষ্টম বর্ষীয় দৌহিত্রকে ডাকিয়া দত্ত কর্ত্তা বলিলেন, "দাদু ভাই, তুই যা, পাস্তি বাড়ীতে কিছু মাছ দিয়ে আয়। পাস্তিদের গিন্নী একবার এসেছিল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন ত তাঁরে দেখচি নি। তাঁদের হয়ত কুটুম এসেছে।"

দৌহিত্রটী বলিল,—হঁা দাদু, পান্তিদের বেশী মাছ দিতে হবে; তাদের ঘরে কুটুম এসেছে।”

কর্ত্তা—তা বেশ দাদা ভাই, তুমি নিজের ইচ্ছেমত দিয়ে এস।”

বালক মহানন্দে ছুটিয়া গিয়া একটী প্রকাণ্ড কচু পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহাতে প্রায় আট নয় সের মাছ ও বড় বড় চারখানি মুড়ো তুলিল। উত্তম করিয়া সেগুলি পাতার মধ্যে একত্রে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কচি ছেলে, সে দশসের মৎস্য কচু পাতায় লইয়া যাইতে পারিবে কেন? অমনি দাদা বলিলেন, “বলি, অ বড় মানুষের ছেলে। কোন যুগ্যন্তা নেই, কেবল বাপের মত নজরটা আছে? ঐ অত মাছের তেল তারা কোথা পাবে, যে তুই তুলতে পারিস নি এত মাছ একটু কচু পাতায় নিয়েচিস্?”

দৌহিত্র; “তা হোক দাদু, আমি তাদের তেল-ও না হয় দুসের দিয়ে আসব এখুন। আপনি পুঁটেকে আদ্দেক গুলি নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে বলুন; আমি এই মাছ গুলি সব তাদের দেব।”

কর্ত্তা আঁতুরে নাতীর কথামত পুঁটে নামক ভৃত্যকে তাহার সাহায্যে পাঠাইলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে বলিলেন;—"ওগো গিন্নি, লক্ষ্মীর বেটা যে প্রায় দুশ সের মাছ পান্তিদের দিতে নিয়ে গেল। আমি বল্লুম অত মাছ তারা তেল কোথা পাবে যে রাঁধবে? তা বল্লে কি জান?—আমি তাদের দু সের তেল দিয়ে আসব।"

গৃহিণী কর্ত্তার কথা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন; "তা বেশ ত; পান্তিদের না হয় দু আড়াই সের তেল দেওয়া গেল।" তিনি এই বলিয়া ভাণ্ডারে যাইয়া, একটী নূতন ভাঁড়ে দুই আড়াই সের পরিমাণ তৈল বাহির করিয়া রাখিলেন।

পান্তিদের বাটীর প্রাঙ্গণে মাছগুলি রাখিয়া ছেলেটী তাহাদের গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"পান্তি দিদি, তোমাদের মাছ রইল। এইবার তেল আন্‌তে যাচ্ছি। তোমরা তেল কিনো না।" এই কথা বলিয়াই দৌড় দিল। পান্তি গৃহিণী প্রাঙ্গণে রাশীকৃত মাছ দেখিয়া মহানন্দে সকলকে ডাকিয়া দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "বাবা কত মাছ এনেছে দেখ!

আবার মোরা এত মাছ ভাজতে তেল কোথা পাব বোলে তেল আন্‌তে গিয়েছে। হাজার হোগ কায়েতের ছেলে কি না, খুব দরাজ নজর। এমন দেওয়া ত কারুর দেখিনি।"

পান্তিদের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় বালকটী দুই হাতে ধরিয়া একটী নূতন ভাঁড়ে দুই আড়াই সের তৈল লইয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। পান্তি গৃহিণী প্রস্তুত ছিলেন, বালক বাটী প্রবেশ করিবামাত্র একটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া এক হাতে তাহার হাত ধরিলেন এবং অপর হাতে ভাঁড়টী ভূমিতে স্থাপন করিয়া, 'বাছ আমার' বলিতে বলিতে তাহাকে বক্ষে লইয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। বালকটী অতিশয় চঞ্চল; ছটকট্ করিয়া নামিয়া পড়িলে গৃহিণী বলিলেন; "বেঁচে থাক দাদা আমার, চিরজীবি হও, নাইতে যেন কেশ না ছেঁড়ে। আর তোমার দিদিমা জন্ম এইস্ত্রী হোগ।" ইত্যবসরে বালক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে পান্তি গৃহিণী বলিলেন, "কেন ভাই, মোদের কুঁড়েয় কি একটু বস্‌তে নেই? একটু বস, কেঁড়েটী আজ্‌ড়ে দিই।"

বালক ; "না পান্তিদিদি, কেঁড়েটী আমার দিদিমা তোমায় দিয়েছেন। আমি যাই, তোমাদের ছেলেরা ত পাঠশালে গেছে?" খেলার সঙ্গী নাই সুতরাং সে পলায়ন করিল।

বৃদ্ধা—'কি সুন্দর ছেলেটি, যেন ননীর পুতুল।'

এমন অনাটনের সময়ে পান্তির গুরুদেব একদিন সন্ধ্যা কালে আসিয়া উপস্থিত ; রাত্রি প্রভাতে কল্য তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ, শিষ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাইলেন। শুভ সংবাদটী শ্রবণমাত্র কৃষ্ণ পান্তি চিন্তায় অস্থির হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি হবে, মা, গুরুঠাকুরের মার ছেরাদ্দ, কিছু নিয়ে যেতে হবে ত?"

মাতাও চিন্তিতা হইয়া বলিলেন; "এখন সন্ধ্যের সময় ত কেউ ধার দেবে না, আর চাইতেও নেই বাবা, তা না হোলে দুচার কাটা চালই নিয়ে যেতে। এত ধার হয়েছে, না হয় ঠাকুর মোশায়ের জন্যে আরো কিছু ধারই হত। দেখি ঘরে খুঁজে পেতে কি আছে না আছে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা খুঁজিয়া পাতিয়া কেবল কতকগুলি ভাজা কলাইয়ের দাল ও একটু লবণ পাইলেন। ভাঙ্গা বস্তু দেওয়া

নিষিদ্ধ, সুতরাং কেবলমাত্র লবণটুকু একটী নূতন সরাতে স্থাপন করিয়া পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর মোশাই জানেন মোদের উদ খেতে খুদ নেই। এই নুনসরাটী হাতে করে গড় কোরো।"

গুরুদেবের বাটী শান্তিপুর, রাণাঘাট হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই কৃষ্ণ যাত্রা করিল। সে দিন শন্তু হাটে যাইবে। সূর্য্যোদয়ের একটু পরে অতি বিমর্ষ ভাবে কৃষ্ণ ঠাকুরমহাশয়ের বাটী প্রবেশ করিল। গুরুদেব প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, সভার জন্য শয্যা প্রস্তুত করাইতেছেন। পান্তি লবণ পাত্রটী সম্মুখে রাখিয়া গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। কেবলমাত্র একসরা লবণ দেখিয়া গুরুদেব অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া পদাঘাতে সরাটীকে চূর্ণ বিচূর্ণ ও শিষ্যকে অজস্র কটূক্তি করিয়া দূর হইয়া যাইতে বলিলেন। কৃষ্ণপান্তির হৃদয়ে শেল বিদ্ধিল। সে ম্রিয়মাণ হইয়া প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। তখনও নিস্তার নাই। উপর্য্যুপরি অজস্র অকথ্য গালি বর্ষণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নানা

দ্রব্যসম্ভার লইয়া বহুলোক আসিল ; গুরুদেবের রুদ্র ভাব একটু প্রশমিত হইল। জিনিষপত্র গুলির সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পান্তি সেই অবসরে তথা হইতে অপসৃত হইল। কোটি বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া স্নানাঘাটে আসিয়া চূর্ণিতে অবগাহন করিতে গেল।

চতুর্থ অধ্যায়।

পান্তি চূর্ণিতে গিয়া দেখিল, এক প্রকাণ্ড চার হাজার মুণে বজরার উপর একজন ভদ্রলোক ছৈ হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতেছেন ; পশ্চাতে আরও ঐরকম বড় বড় কিস্তি। লোকটীকে দেখিবা মাত্রই পান্তির চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইল, সে ভাবিল, "মানুষটী নিচ্চয় কোন বড় মহাজন কারবারী নোক, মালপত্তর কেনবার খোঁজে এসেচে।" এই চিন্তা করিয়া গামছা হস্তে কটিদেশ পর্য্যন্ত জলে অবতরণ পূর্ব্বক অগ্রে গামছা সিক্ত করিয়া মস্তকে একটু জল দিয়া,

পান্তি মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিল; "মোশায়ের নিবাস? কোথাই বা যাওয়া হবে?"

মহাজন একটু বক্রদৃষ্টিতে পান্তিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এখন একজন স্থানীয় লোক পাইয়া, পণ্য দ্রব্যাদির সন্ধান পাইবেন মনে করিয়া উত্তর করিলেন, "বাপু, নিবাস ত অনেক দূর, কোলকেতা। কোথায় যাব তার কিছুই স্থির নেই।"

পান্তি সরল উত্তর পাইয়া পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনকার কিসের কারবার? এখানে কি কোন মাল বিক্রী করতে এসেছেন?"

কথার ভাবে মহাজন মনে করিলেন, এ কারবারী লোক, সুতরাং আরও অনুসন্ধিৎসু হইয়া সরল ভাবে বলিলেন; "বাপু নৌক ত দেখ্‌চ খালি। কোন মাল পত্তর সঙ্গে নেই। মালপত্তরের চেষ্টায় এসেছি। এখুন কোলকেতায় ছোলা দুষ্প্রাপ্য হয়েচে, দরও খরিদ্দারে বেশী দিতে চায়। কিন্তু মাল না পেলে কি হবে, আমি ছোলার সন্ধানে এসেছি।"

পূর্ব্বকার শুভ ঘটনাগুলির সাঙ্কেতিক অর্থ কে যেন পান্তির মনের ভিতর বলিয়া দিল। আর বিদ্যুদ্বেগে ভবিষ্যত উন্নতির উত্তর কেন্দ্রালোকে

তাহার চিদাকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। অমনি আবার পান্তিকে কে যেন বলিয়া দিল, "বাবা, এই তোর সময় ফির্‌ল; কিন্তু এ বড় পরীক্ষার সময়, সাবধান।"

ঘটনার বিবৃতিতে বহু সময় লাগে, কিন্তু এপ্রকার মানসিক ঘটনা ঘটিতে তিলার্দ্ধ মূহূর্ত্তও লাগে না। পান্তি ধীর ভাবে সওদাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রস্তাব করিল, "আপনকার যদি ছোলা আমদানি করবার মতলব থাকে, ত মুই এখানেই ছোলার আমদানি করতে পারি, আর মোশায়কেও হেথা হোথা ঘুরে বেড়াতে হয় না।"

সওদাগর ছোলার আমদানী হইতে পারে শ্রবণ করিয়া সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কি দরে আমদানী করতে পার বাপু?"

অতি সরল দৃষ্টিতে মহাজনের মুখের প্রতি তাকাইয়া পান্তি উত্তর করিল, "মোশাই, দরের কথা কেমন করে বলি? ছোলার সন্ধান মোর আছে। দরদস্তুর গোলাদারের হাত। মুই মাল দেখাব, মোশাই দর দেবে, মোর তাতে কিছু থাকে মোশাইকে দেব, মোশাই নেবে। তবে আপুনি যে ছোলা খরিদ কর্‌তে পিস্তুত আছ, তার একটা কড়ার

পত্তর নিকে দেও, মুই এখুনি মালের নমুনো আনি।” পান্তি এই প্রস্তাব করিতেকরিতে মহাজনের মুখে কার্য্যসিদ্ধির ধ্রুব লক্ষণ প্রতিফলিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে গাত্র মার্জ্জনা করিয়া, স্নান করিতে লাগিল।

সওদাগরের পক্ষে এখন ছোলা যত শীঘ্র পাওয়া যায় ততই ভাল। ছোলা আমদানি করিবার নিমিত্ত নানা মহাজন নানা দিকে যাত্রা করিয়াছে। যে সর্ব্বাগ্রে আমদানি করিতে পারিবে তাহারই ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সওদাগর এই চিন্তা করিয়া পান্তির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে স্নানান্তে বজরায় আসিয়া চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইতে বলিলেন। স্নানান্তে পান্তি মহাজনের পত্রখানি লইয়া গামছা মাথায় দিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিল। তৎপরে অন্তরালে মাতাকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল, “মা, আড়ংঘাটায় গোঁসাই-জির অনেক ছোলা আছে। মুই একবার তাঁর কাছে যাব। তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা যেন কার্য্যসিদ্ধি হয়।” এই বলিয়া কৃষ্ণ মাতার পদধূলি মস্তকে লইয়া, আহারের জন্য বিলম্ব না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বাহির

হইয়া দ্রুতবেগে আড়ংঘাটার দিকে চলিল।

আড়ংঘাটা রাণাঘাট হইতে তিন ক্রোশ। সোথানে একটী মস্ত হাট হইয়া থাকে। পান্তির সেই হাটে গতিবিধি থাকায়, সে সেখানকার সকল বিষয়ই অবগত। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তথায় একটী যুগলকিশোরের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, বিগ্রহের নিত্যসেবা ও দেবালয়ের অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রচুর বিষয় সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত সম্পত্তির আয় হইতে বিগ্রহের নিত্যসেবা, বহু নাগা সন্ন্যাসীর নিত্যসেবা ইত্যাদি বহুবিধ দান কার্য্যাদি করিয়াও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। বুদ্ধিমান মোহান্ত সেই উদ্বৃত্ত অর্থে, মহাজনি ও তেজারতি ব্যবসা করিয়া দেবসম্পত্তি আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তখন হইতেই আড়ংঘাটা একটী বড় বাণিজ্য স্থান হইয়াছে, এবং দেবালয় সংলগ্ন গোলাসমূহে ধান, গম, তিসি, ছোলা, মটর প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্যও বহু পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। কৃষ্ণপান্তি বর্ত্তমান মোহান্ত গঙ্গারামের পান সরবরাহ করে। মোহান্তও কৃষ্ণকে তাহার সরলস্বভাবের জন্য বিশেষ স্নেহ করেন। মোহান্তের সদ্‌গুণে

সকলেই তাঁহার বশীভূত। তাঁহাকে সকলে গোঁসাইজি বলে।

দেবালয়ের সন্নিকটে আসিয়া পান্তির মনে হইল, "এই একজন বামুন কেমন ভাল, মান অভিমান জানে না, আর কি ভালবাসারই মানুষ, কারুকে ছোট বড় জ্ঞান করে না।" এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব কৃত অবমাননারও স্মরণ হইল। আবার পূর্ব্ববৎ কোটি বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। চিদাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল; হৃদয় অভিমানের তরঙ্গাভিঘাতে যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

গোঁসাইজি কিরূপ সাধুসেবা হইতেছে দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়াছিলেন; অদূরে পান্তিকে বিমর্ষ ভাবে মন্দিরাভিমুখে আসিতে দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন। পান্তি নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কি কেষ্ঠ পান্তি যে! এমন সময়? বেবারে এখানে যে? আর এত মন-মরা চেহারাই বা কেন? কি হয়েছে?"

প্রাণের আবেগে পান্তি অশ্রুবিগলিত নেত্রে গুরুদেবকৃত অবমাননের কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া, পরিশেষে বলিল; "দাদাঠাকুর, মুই দরিদ্দির

বঁলেই না এতটা হল।”

গোঁসাইজির হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তিনি স্নেহ-কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন; “পান্তি দাদা,বেলা ত অনেক হয়েছে, আহার ত হয়নি দেখছি?”

পান্তি অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে বলিল, “না দাদাঠাকুর।”

গোঁসাইজি; “তা বেশ এখানে প্রসাদ পাও। আর আমি একটা উপায় ঠাউরেচি। যা হয় একটা বন্দোবস্ত করব। এখুন মুখে হাতে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হও। আমি আস্চি।” এই বলিয়া গোঁসাইজি চলিয়া গেলেন। পান্তি পুষ্করিণীতে হস্ত পদ ধৌত করিয়া গোঁসাইজির গৃহের সম্মুখে গিয়া উপবেশন করিল। অনন্তর এক ভৃত্য আসিয়া বলিল, “পান্তি মোশাই এস, তোমার পেসাদ পাবার ঠাঁই হয়েছে।” পান্তি ভৃত্যের সহিত অতিথিশালায় উপস্থিত হইল। তথায় বহুলোক আহার করিতেছে। পান্তিকে একপার্শ্বে একখানি কদলীপত্রে প্রচুর ভাত ডাল তরকারী পয়সান্ন ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে; গোঁসাইজি খড়ম পায়ে, নামাবলী গায়ে, মাথায় গামছা দিয়া তথায় পান্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে-

ছেন। এত যত্ন দেখিয়া পান্তির মনের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হইল।

"পান্তি ভায়া বসে যাও", এই বলিয়া গোঁসাই তাহার নিকট উপু হইয়া বসিলেন।

পান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা ঠাকুর আপনকার সেবা হয়েছে?"

গোঁসাই মৃদুহাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "এইবার হবে। তুমি আহারের পর বিশ্রাম কোরে আমার কাছে যেও। আমার দুগোলা ছোলা পচে পোকা লেগে গেছে শুনছি। আমলারা বলে তাতে বস্তু নেই। তা নয়, কিছু নিশ্চই আছে। আমি তোমায় সেই দু গোলা ছোলা দিলাম। আর তুমি তার মূল্য-স্বরূপ যুগল কিশোরের এক দিনের ভোগ খরচাটী দিও। সেটা বেশী নয়, ন টাকা তের আনা মাত্তর।"

পান্তি আনন্দ-দীপ্ত নেত্রে গোঁসাইজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল; "দাদাঠাকুর, মুই ছোলার খোদ্দের পেয়েছি, তাই ছোলার কথা বল্‌তে এসেছিলাম? তবে গালাগালি খেয়ে প্রণটায় বড় বেজেছিল বলে সেকথা ভুলে গেছলাম।

আপনকার সমস্ত ছোলা মোরে বেচেন, ত মোর তাতে কিছু মুনাফা হয়। মোর খদ্দের নেয্য দর দিতে রাজি আছে।"

গোঁসাই এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তর করিলেন; "আচ্ছা সে কথাও হবে এখুন। তুমি একটু বিশ্রাম কোরে আমার কাছে এস, আমি এখুন ছুটি প্রসাদ পাইগে।"

পান্তি; 'আজ্ঞে হ্যাঁ হ্যাঁ, আপুনি যাও, পেসাদ পাওগা। মুই পরে মোশার কাছে যাব এখুন।" গোঁসাই চলিয়া গেলেন, পান্তি প্রসাদ কপালে স্পর্শ করিয়া ভোজন আরম্ভ করিল।

আহারের পর পান্তি দপ্তর খানার একপার্শ্বে শয়ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় গোঁসাইজি দুই গোলার চাবি আনিয়া পান্তির হাতে দিয়া বলিলেন; "এই নেও কেষ্ট চাবি; এই দিকে এস।" এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া গোলা দুটী দেখাইয়া দিলেন, ও ছোলা ঝাড়াই করিয়া লইবার পরামর্শ দিয়া, অন্য গোলার ছোলা কিরূপ অবস্থায় আছে দেখিতে গেলেন।

পান্তি গোলার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ছোলা পচা

দুর্গন্ধে প্রথমে কিছু হতাশ হইল। কিন্তু অমনি কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে গোলার একস্থানের পোকা ধরা ছোলা সরাইয়া ভিতরে উত্তম ছোলা দেখিয়া আনন্দিত হইল। তখন কৃষ্ণ সে গোলায় চাবি বন্ধ করিয়া অপর গোলাটী দেখিল, সেও তদ্রূপ।

গোঁসাইজি অন্য গোলাগুলি দেখিয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে যাইলেন। তথায় ইচ্ কতরটি উন্মুক্ত করিয়া দুই গোলা ছোলার খরচ লিখিবার জন্য জাব্দা খাতাখানি বাহির করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন কর্ম্মচারী পান্তির শুভাদৃষ্টের সূচনা দেখিয়া, গোঁসাইজির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল; "কত্তা মশাই, ওত সব ভাল ছোলা, বড় জোর হাত খানেক কি হাত দুই পচা পোকা ধরা। বাকী সবই ত ভাল ছোলা দেখলাম। আপনার উচিৎ নয় অমনি দেওয়া, বড় লোকসান হবে; একটা নেয্য মূল্য ধরে নিন্।"

কর্ম্মচারীর তোষামোদপূর্ণ কথা শুনিয়া গোঁসাই একটু ব্যঙ্গসূচক গ্রীবাভঙ্গি ও বক্রদৃষ্টিতে উত্তর করিলেন; "বল কি হে! মোটে এক হাতটাক্

পচা, বাকী সব ভাল? তা হলে ত সত্যিই লোক-সান হবে? এখন উপায়?” এই কথা বলিতে বলিতে ইচ্‌কভরের উপর কনুই রাখিয়া অবনত মস্তকে জাবদায় দুই গোলা ছোলার লোক্‌সানি খরচ লিখিলেন।

কর্ম্মচারী সাহস পাইয়া বলিল; “হাঁ মশাই, তবে ঝাড়াইটা হোগ, তারপর ওজন মত মূল্য নিলেই চল্‌বে।”

এইবার গোঁসাই কর্ম্মচারীর মুখোপরি ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন; “বলি বাপু, তোমরাই ত বলে ছিলে ছোলা পচে পোকা ধরে উড়কুড় উঠে গেছে, তাতে পদার্থ নাই। আর এখন কেষ্ট পান্তি সেই ছোলা ছুঁতে মাত্তর সব ভাল হয়ে গেল? তা বেশ সেটা ত কেষ্টপান্তির অদেষ্ট, যুগল-কিশোরের ইচ্ছেয় হয়েচে। তা বলে কি এখন ওজন কোরে, দাম নিতে হবে? আর সেই দামের কথাও ত আগে বলেছি, যে গোবিনজির একটা ভোগ দেবে। এখন কি আবার সেই কথা পাল্‌টে ওজন মত দাম ধরে নিতে হবে? আহা মরি, কি সৎপরামর্শই দিলে! যদি সব পচাই বেরুত, কেষ্ট পান্তি

ঘর থেকে টাকা এনে যুগল কিশোরের ভোগ দিয়ে যেত ? কি পরামর্শই দিলে বাপু! আমার মনে বড়ই ভয় হয়ে ছেল, পাছে সমস্তই পোকা ধরা বেরোয়, বড়ই খুসী হইছি, ভাল ছোলা বেরিয়েছে। নারায়ণের ইচ্ছেয় আমার কপালে সব পোকা হয়েছিল, পাস্তির অদেষ্টে তিনি সব ভাল কোরে দিয়েছেন। আমি বড়ই খুসী হইচি। এখুন যাও শীগ্‌গির ঝাড়াই করবার বন্দোবস্ত যাতে করতে পার, তার চেষ্টা কর।"

নির্লজ্জ কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণ রাগে গবগর করিতে করিতে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন; "সব চোর, বলে কি না লোকসান হবে, মূল্য ধরে নেও। মানুষকে দিয়ে আবার নেবে। এটা মুনিবের খয়েরখাঁই। একবার ভাবে না নারায়ণের কৃপায় গরীব কিছু পেয়ে গেছে বেশ হয়েছে। মতলব পাস্তির কাছে কিছু আদায় করা, আর আমাকে বোকা বোঝান। কি পেচোয়া বুদ্ধি রে বাবা! মরুক্‌গে, এখুন যাই নিজে না দেখলে, ঝাড়ায়ের বন্দোবস্তই হয়ত হিংসেয় করবে না।"

গোঁসাই পাস্তির নিকট গিয়া বলিলেন; "হুঁ।

পান্তি দাদা, ভাল কথা, আমি দেখলাম সকল গোলাতেই ত পোকা লেগেছে। আমি ত আর মাল ধোরে রাখ্‌তে পার্‌ব না, তা হলে লোকসান হবে। সবই বেচে দেব। তুমি একবার সব গোলা-গুলি দেখে এস; আমি বৈঠকখানায় আছি; সেখানে সব কথা শেষ কর্‌ব।” এই বলিয়া অপর গোলা কয়টীর চাবি গোছাটী পান্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া গোঁসাই চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণপান্তি সকল গোলার দুই এক হস্ত পরিমাণ ছোলা অপসারিত করিয়া দেখিল, পরে মোহান্তজির নিকট প্রস্তাব করিল; “দাদাঠাকুর, সব গোলাতেই দেখলাম, হাত খানেক হাত দেড়েক কোরে মাল একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। মোর বিবোচনায় ছোলা গুলির দুরকম দর হওয়া উচিত। পচার এক রকম, আর ভাল ছোলার এক রকম। আপুনি মনের মত দুরকম দর দাও। তা’পর মুই মোর অদেষ্টটা বেয়ে চেয়ে দেখি। অবিশ্যি মোর দুপয়সা থাকে সেটা আপুনি নিচ্চয় দেখবে।”

গোঁসাই গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন; “তুমি ঠিকই বলেচ। দুরকম দরই হওয়া উচিত। তা

আমি বলি ভাল ছোলা আর পোকা ধরা ছোলার একদর বার আনা রইল; আর যাতে শাঁস নেই, একেবারে ভুসী, তার দর রইল তুআনা মোণ। আর প্রথমে যে তুগোলা তোমায় দিয়েছি, তার জন্যে মোট ন টাকা তের আনা, যুগল কিশোরের কেবল এক দিনের ভোগ দিও। এর ওপর, ভগবান না করুন, যদি তোমার কিছু লোকসান হয়, তা তোমায় দিতে হবে না। সে বিষয় বিবেচনা করব। সে দায় তোমায় ঠেকৃতে হবে না, কেষ্ট! তুমি যাও মহাজনকে এখানে নিয়ে এস।"

সন্তুষ্ট হইয়া পান্তি বলিল; "যে আজ্ঞে, দাদা ঠাকুর! তবে ঐ কথা বাহাল রেখে একটী বায়না পত্তর মোরে নিখে দেবে, না মুই কেবল নমুনো লিয়েই মহাজনকে দেখাব?"

মোহান্তজি; "আমার কথায় বিশ্বাস হবে না?"

কৃষ্ণ দন্তে জিহ্বা কাটিয়া উত্তর করিল; "সে কি, দাদাঠাকুরের কথায় বিশ্বাস করব না, তাও কি হতে পারে! তবে মুই কেবল নমুনো লিয়ে মহাজনকে দেখিয়ে, একটা দর ঠিক করে, তারে এখানে আনি; মোদের আর ঝাড়াই বাছাইটে করতে হবে না;

খন্দেরই সেটা কোরে লেবে।”

গোঁসাই উত্তর করিলেন; “সেটা আমি তোমার ওপর নির্ভর করব। ঝাড়াই খরচাটা বাঁচাতে পার ত সেটা তোমারই লাভ থাকবে, নইলে সেটা আমার লোকসান পড়বে।”

কৃষ্ণ; ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া, তিন রকম ছোলা উত্তম, কীটদষ্ট ও ভূসীর নমুনা লইয়া গামছার প্রান্তে পৃথক পৃথক বাঁধিয়া দ্রুতপদে গমন করিল।

সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নমুনা দেখাইয়া পান্তি প্রস্তাব করিল, “মোশাইকে মাল গোলা থেকে ঝাড়াই বাছাই কোরে নিতে হবে। তার পর মাপাই কোরে আপুনি রপ্তানি করবে। তবে আপুনি নতুন মানুষ নোকজন কোথা পাবে? মুই গোলদারকে বোলে ঝাড়নদার নোক জন মিলিয়ে দেব। তাতে মোশাইকে বেগ পেতে হবে না। কেবল মোরা কাজের ভার বা ঝাড়ায়ের খরচার দায় লিব না। আপুনি তা বুঝে দর দিও।”

কৃষ্ণপান্তির সরল বাক্যে অতি সন্তুষ্ট হইয়া মহাজন বলিলেন; “সব খোলসা কথাই ভাল, নইলে শেষে বড় গোল হয়।” এই বলিয়া

নমুনাগুলি পরীক্ষা করিলেন। তিনি অনন্তর তাঁহার জনৈক সহযাত্রী কর্ম্মচারীর সহিত বস্ত্রাবরণে পরস্পরের হস্তে হস্ত মিলাইয়া সাঙ্কেতিক পরামর্শ করিলেন; তৎপর পাস্তিকে বলিলেন; "যদি আমাদেরই ঝাড়াই বাছাই কোরে নিতে হয়, ত এই নমুনা মত ভাল ছোলার দর রইল দুটাকা; পোকা ধরার দেড় টাকা; আর ভূসীর বার আনা মোণ। আপনি এতে রাজি হন ত এখুনি লেখা-পড়া হোগ। আমি এখুনি বায়না দিচ্ছি।"

দর শুনিয়াই একবার পাস্তির বুকের ভিতর দুড়দুড় করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই পাস্তি বুঝিল যে এতে আর উল্লাস কি করিবে, এই ত সবে সূত্রপাত। অবিচলিত ভাবে পাস্তি মহাজনকে বলিল; "আচ্ছা তাই হবে, মুই রাজি আছি, মোশাই বায়না পত্তর নিখ, বায়না কর। মাল মুই আজই সরবরা করতে পারি। মোশায় কবে মাল দেখতে যাবে থির কর।"

মহাজন তৎক্ষণাৎ বায়নাপত্র লিখিয়া সহস্র টাকার একটী তোড়া দিয়া বায়না করিলেন। পরে বলিলেন; "আপনি বলছেলেন আজই মাল

সরবরা কর্‌তে পারেন। তাহলে ভালই হয়; মাল কোথায় আছে?”

পান্তি—আড়ংঘাটায়।

মহার্জন—সে কতদূর? এখন যদি আমরা রওনা হই ত কখন পৌঁছব?

পান্তি—“হাঁটাপথে তিন কোশ। তেমন গুণ টেনে যেতে পারলে মোরা ঠিক্‌ সন্ধ্যের সময় সেথা পৌঁছব।” সন্ধ্যা হইতে তখনও প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব।

মহাজন তখনই নৌকা ছাড়িতে আজ্ঞা দিলেন। পান্তি সেই নৌকায় রহিল। আড়ংঘাটায় উপস্থিত হইতে কিন্তু রাত্রি হইয়া গেল। সেদিন আর কোন কাজই হইল না। কৃষ্ণপান্তি বায়নার টাকা গুলি গোঁসাইজির সম্মুখে স্থাপন করিয়া মাল রপ্তানি করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রাত্রেই লোকজন স্থির করিয়া রাখিতে বলিল। পরদিন মহাজন নিজব্যয়ে সমস্ত মাল ঝাড়াই বাছাই করিয়া ওজন মত মূল্য দিয়া নৌকা বোঝাই করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যে ছয় সাত গোলার সমস্ত মাল লইয়া মহাজন প্রস্থান করিলেন।

পাস্তি মহাজনের নিকট টাকা লইয়া সমস্ত মালের দাম হিসাব করিয়া গোঁসাইয়ের হস্তে প্রদান করিলে, গোস্বামী কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন; "তা হয় না কৃষ্ণ, আগে যে ছুগোলা মাল তোমার নামে ন টাকা তের আনায় খরচা লিখে ফেলেছি।"

পাস্তি জিদ করিয়া বলিল; "তা হলেই বা দাদা ঠাকুর, খাতা ত কাটা যেতে পারে। মুই এতটা ট্যাকা মুনফা যখন পেলুম তখন যুগল কিশোরের বস্তু ওমনি কেন নেব? মানুষে দেবতারে দিয়েই থাকে, ঠাকুর দেবতার জিনিষ কে কবে লিয়ে থাকে? আপুনি কোন আপত্তি কোর না।"

মোহান্ত হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন; "তবে যুগলকিশোর আমার মুখ দিয়ে ওকথা বলালেন কেন? একদিনের ভোগের দাম নিয়ে ছুগোলা ছোলা তোমায় দেব কেন বল্‌লুম? যুগলকিশোর কি আমায় মিথ্যা বলিয়েছেন?"

কৃষ্ণপাস্তি নিস্তব্ধ হইয়া গোঁসাইয়ের মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। গোঁসাই পুনরায় হাস্যবদনে চুপি চুপি বলিলেন; "আর ভাই আমার বিশ্বাস ঠাকুর দেব-

তারা দেন তবে আমরা পাই। এসব ঐশ্বর্য্য তাঁদের, আমরা তাঁদেরই নিচ্চি; আহাম্মকে ভাবে সব আমাদের, তাইতেই যত অহঙ্কার, কুবুদ্ধি এসে পড়ে।"

পাস্তি নিরুত্তর। কেবল তাহাঁর নেত্রকোণে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। পাস্তির সরস হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া গঙ্গারাম অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন; "পাস্তি দাদা, ঝাড়াই, বাছাই আমাদের কোরতে হল না। নইলে যে রকম পোকা লেগেছিল, আর কিছুদিন বিলম্ব হলে, সমস্তই লোকসান হয়ে যেত, এক পয়সাও আদায় হত না। সে যাক্ তুমি পৌনে আট হাজার টাকা পেলে, আমি বড়ই খুসী হয়েচি। আজ থেকে তোমার সময় ফিরল। তবে ভাই একটা কথা বোলে রাখি, স্মরণ রাখিস, দাদা, ব্যবসার স্থানটা ধর্ম্ম-স্থল বলে মানিস্।" একটু অন্তরালেই এই সব কথা হইতেছিল। মোহান্তজি এইবার পাস্তির হস্ত ধারণ করিয়া আরও কিঞ্চিৎ অন্তরালে গিয়া বলিলেন; "দেখ্ ভাই, আম্লাগুলোকে কিছু দিস্। তারা ঠাউরে রেখেছিল তাদের হাত দিয়ে বিক্রী হবে, মাল ঝাড়াই বাছাই হবে, তারা কিছু পাবে।"

পান্তি উত্তর করিল; "অবিশ্যি দাদাঠাকুর, ওদের সন্তুষ্ট করব বই কি? মুই তা ত করবুই ঠাউরে ছিনু। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় এতটা ট্যাকা পেলাম, তা দেব বৈকি, একলা খাওয়ায় আমোদ নেই।"

প্রত্যেকেরই পদানুসারে আমলা এবং ভৃত্য-দিগকে পাঁচ, দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ করিয়া প্রায় সর্ব্ব-শুদ্ধ তিন শত মুদ্রা বিতরণ করা হইল। পরে গোঁসাইজির লোক মারফৎ একখানি প্রণামি পত্র ও দুইশত মুদ্রা তাঁহার গুরুঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়া পান্তি গৃহে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। গোঁসাই নিজের নৌকায় নিজের পাইক সঙ্গে দিয়া পান্তিকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ঠাকুর বাড়ী প্রসাদ পাইয়া পান্তি জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নৌকারোহণ করিল। নৌকা খুলিতে মাল্লারা বড়ই বিলম্ব করিল। তাহারা এরূপ হিসাব করিয়া নৌকা ছাড়িল যে ঠিক্ সূর্য্যোদয়ে রাণাঘাট উপস্থিত হইবে। পান্তি নৌকারোহণ করিয়াই এক ছিলিম তামাক খাইয়া, যুগলকিশোরকে প্রণাম করিয়া শয়ন করিল। শয়ন করিবামাত্রই নিদ্রা-ভিভূত হইল।

নিদ্রাভঙ্গে পান্তি উঠিয়া দেখিল পূর্ণিমার চন্দ্র প্রায় অস্তাচলে, নৌকায় সকলেই নিদ্রিত; কেবল মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়া আছে; নৌকা এক-টানায় ভাসিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; একবার পাপিয়া ডাকিল, আর প্রকৃতি শিহরিয়া উঠিল। আবার কোকিল এমন দ্রুত কুকু করিয়া উঠিল, যেন মনে হইল, কৌমুদী, জল, জঙ্গল পর্য্যন্ত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। পান্তির চক্ষুর সমক্ষে গোঁসাইজির সদয় ব্যবহারের ছবিগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। পান্তি উঠিয়া ছৈয়ের বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া মুখে ও চোখে জল দিল। পরে ছৈ হেলান দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল; "গোঁসাইদাদা, যথার্থই ধাম্মিক মানুষ তুমি। তোমার সল্লা মুই কখুনো ভুলব না। সত্যিই সংসারধম্মও যেমন কারবারধম্মও তেমনি। মানুষে কি করতে পারে? কিছুই ত না; সবই ত দেখছি ভগবানের হাত, তাঁর খেলা। এইত তিরিশ বচ্ছর বয়স হোল, কত চেষ্টাই না করিচি, কৈ এতদিন, কি করতে পেরেচি? কিছুই ত না! ভগবানের ইচ্ছে হল, তবেই ত এতটা টাকা পেয়ে গেলাম। তিনি ত

নিজেই ট্যাকাগুনো মোর হাতে তুলে দিলেন। কি আশ্চয্যি; মানুষ কিছুই নয়! কোন ক্ষেমতাই নেই! আর মরে কেবল গুমোর কোরে; হায় হায়! একবার তলিয়ে দেখে না, কিসে কি হচ্চে! ঠিক্ কথা, তাই গোঁসাইদাদা বললে কারবারটা ধম্মস্থান বোলে মানতে। তা না ত আর কি? মুই ত সেই ঈশ্বরের দাস মাত্তর! তিনি যেমন ফেরাচ্চেন করাচ্চেন তেমনি করছি! তার বেশী এক তিলও নয়, কম একতিলও নয়, সাদ্দি কোথা? মহাজনকে মুই তার ঘর থেকে ডাকৃতে গেছি কি? কোথাকার জল কোথায় আনলে দেখ! একদিক থেকে মোরে নাথি ঝেঁটা মেরে আর একদিকে এনে এমন যোগাযোগ কোরে দিলে যে, মোর কিছুই করতে হল না, গড় গড়িয়ে ট্যাকাগুলো মোর হাতে চলে এল। ঠাকুর তুমি কি চক্রী! আগে থেকে সব ঠিক ঠিকানা কোরে রেখেচ।" এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময় কোকিল কু কু করিয়া উঠিল; পান্তি বিরক্ত হইয়া বলিল; "ন্যারে, কু নয়, সু। এইটে না বুঝেই মান্ষের আক্কেল বিগ্ড়ে যায়। চক্রীর ফেরটা ত মুই বুঝতে এতদিন পারিনি। মহাজনের দর পেয়েই

পঞ্চম অধ্যায়।

কয়েকদিন পরে কৃষ্ণপান্তি কলিকাতার অন্তর্গত হাটখোলায় কতকটা জমি ইজারা লইয়া তদুপরি গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় থাকিয়া কারবার আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তথাকার অপরাপর ব্যবসায়িদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও ক্রমে যথেষ্ট আত্মীয়তা জন্মিল। কৃষ্ণপান্তি উত্তরোত্তর উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন তিনি কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে ও মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করেন। যে স্থানে যে দ্রব্য সস্তা পান, তাহা ক্রয় করেন, এবং যে স্থানে যে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য তথায় তাহা আমদানি করিয়া বিক্রয় করেন; যথেষ্ট মুনফা হয়।

একদিন হাটখোলার কোন পরিচিত মহাজনের নিকট শ্রবণ করিলেন যে কোম্পানির কাছে লবণ ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। কৃষ্ণপান্তি তৎক্ষণাৎ লবণের ব্যবসা সম্বন্ধীয় সমস্ত

জ্ঞাতব্য অনুসন্ধান করিয়া, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহাজনের সহিত লবণের যৌথ কারবার আরম্ভ করিলেন।

প্রায় একবৎসর কাল অংশীদাররূপে লবণের ব্যবসা করিবার পর কৃষ্ণপান্তির এই অভিজ্ঞতা জন্মিল যে তাঁহার মত কাহারও সাহস নাই; ক্রয় বিক্রয়ের যথার্থ সুবিধা এবং অসুবিধা সকলে ঠিক বুঝিতে পারে না, এবং উহা বুঝাইয়া দিলেও সাহস অভাবে কেহ পরামর্শানুযায়ী কার্য্যে তৎপর হয় না। সুতরাং কৃষ্ণপান্তির হস্তপদ বদ্ধ বোধ হইতে লাগিল। কারবারে বর্দ্ধিষ্ণু অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহার সাহসও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৎসরান্তে হিসাব নিকাসের পর দেখা গেল যে লবণের ব্যবসায় তাঁহার অংশে কুড়ি একুশ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। তিনি সম্যকরূপে বুঝিলেন যে এতদিন স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিলে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইত। সুতরাং একদিন সুবিধামত তিনি অংশীদার ভ্রাতাদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে করজোড়ে, বিনীত ভাবে নিজে পৃথক হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। পান্তি অংশীদারদিগকে ক্রমাগত অসমসাহসিক কার্য্য করিতে পরামর্শ দিতেন। কখন তাঁহার পরামর্শ মত

কার্য্য করিয়া তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন, এই ভয়ে পূর্ব্বেই পৃথকহইবার ইচ্ছা তাঁহাদের অনেকের মনে উদয় হইয়াছিল,কেবল সাহস করিয়া কেহই সে প্রস্তাব পান্তির সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এখন স্বয়ং পান্তির মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিলেন।

বিপাকে কারাবদ্ধ বীরেন্দ্র কেশরী কারা মুক্ত হইলে তাঁহার যেরূপ আনন্দ হয়, পান্তি মহাশয় কারবারে স্বাধীনতা লাভ করিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন। তিনি এখন অকুতোভয়ে নিজ বুদ্ধি মত লবণ ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। দুই তিন মাসের মধ্যে লক্ষাধিক মুদ্রা লাভ করিলেন। এতৎসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের বলও অসীম বর্দ্ধিত হইল। সেই বৎসরেই কার্য্য বিস্তার মানসে বাঙ্গালা দেশের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু উপযুক্ত স্থানে কারবারের কেন্দ্র বা গদি খুলিলেন; আর মনে মনে চিন্তা করিলেন; "যে ভগবানের চাকুরী করে সে আর কারুর গোলাম হোতে পারে না। ভাগের কারবারে যেন সবাই মোর গলা টিপে রেখেছিল; তাও যদি তারা মোর

সম্বলটা নিয়ে কাজ করত ত তারাও এই রকম তোড়ে কাজ চালাতি পারত। দশজনাকে অন্নও দিয়ে জন্ম সাথ্যক করতি পারত।”

কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণ পান্তি হাট-খোলার প্রধান মহাজন বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি গম, তিসি, ছোলা, মটর, চাল প্রভৃতি শষ্য এবং লবণের কারবারে কলিকাতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। শেষে এরূপ দাঁড়াইল যে কৃষ্ণপান্তি যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ধরিয়া রাখেন সকলে তাহাই করিবার চেষ্টা করে।

এই সময় তিনি তাঁহার একজন আত্মীয়কে কিছু টাকা দিয়া একটী কারবারে লাগাইলেন। সে ব্যক্তি গুড় একটু সস্তা পাইয়া অনেক পরিমাণে তাহা ক্রয় করিল। কিছুদিন পরে গুড়ের বাজার আরও সস্তা হইয়া প্রায় তাহার অর্দ্ধেক মূল্যে দাঁড়াইল। লোকটী ক্ষতির ভয়ে অস্থির হইয়া কৃষ্ণপান্তিকে জানাইল যে সমস্ত লোকসান হইতে বসিয়াছে, এখন কি উপায় করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না।

কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন;

"ভায়া, তুমি কারবার করতি পারবা না। এতে বড় বুকের পাটা চাই; সবার তা হয় না। তুমি এক কাজ কর, তোমার গুড় যে দরে কেনা আছে সেই দরে মোরে তার অদ্দেক বেচে দাও। আর মাল এখুনি চালান লিতি মুই নোকজন পাঠাই।" এই বলিয়া তখনি বায়না পত্র লেখাইলেন, বায়নার টাকাও দিলেন। কতক মাল সেই দিনই পাস্তির গুদামে আনীত হইল। তৎসঙ্গে বহু পরিমাণ মাল বাজার দরে বাজার হইতেও ক্রয় করিলেন। পরদিন হাটখোলায় এই ঘটনা রাষ্ট্র হইল, গুড়ের বাজার চড়িয়া গেল এবং কৃষ্ণচন্দ্র যে দরে আত্মীয়ের মাল ক্রয় করিয়াছিলেন সেই দর দাঁড়াইল। পরদিন পাস্তি আত্মীয়ের অবিশিষ্ট মাল ক্রয় করিয়া লইলেন। পরদিন গুড়ের বাজার অত্যন্ত গরম; সকলেই গুড়ের উপর ঝুঁকিয়াছে, খুব ক্রয় বিক্রয় ও অনেক গুড়ের আমদানী রপ্তানি হইতে লাগিল। হাটখোলায় মহা ভীড়, গরুর গাড়ী মুটে কয়ালের ভীড়ে রাস্তা চলে কাহার সাধ্য। অনূ্ন আট দিনের মধ্যে গুড়ের দর দ্বিগুণ হইল। দালালেরা মহা ব্যস্ত; খুব জোরে ব্যবসা চলিতেছে;

লোক চলাচলের সীমা নাই! কৃষ্ণচন্দ্র একদিন উপস্থিত বাজার দর অপেক্ষা দুই এক পয়সা কম দরে মাল বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। অমনি ক্রেতা উপস্থিত হইল; বায়না হইল, দুই এক লাটে সমস্ত গুড় বিক্রয় হইয়া গেল। তাহাতে অনেক লাভ দাঁড়াইল। আত্মীয়কে গোপনে কৃষ্ণ চন্দ্র বলিলেন; "ভায়া মজাটা দেখলে? এখন তোমার লাভটা তুমি নিয়ে যা ভাল বোঝ তাই করগা?"

একদিন বৈকালে কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে নিমতলার ঘাটের নিকট আসিয়া দেখিলেন অনেকগুলি মাল বোঝাই কিস্তি এবং একজন মহাজনের মত ব্যক্তি একটী কিস্তির উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। পান্তি সেই কিস্তিব নিকট অগ্রসর হইয়া কিস্তিতে কি মাল তাহার দর কত, ইত্যাদি প্রশ্ন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কৃষ্ণপান্তি আকৃতিতে খুব লম্বা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গঠন কৃশ, তাঁহার মুখাবয়ব পৌরুষ ব্যঞ্জক, নাশা গ্রন্থিটী উচ্চ, ওষ্ঠাধর বেশ রুচির ও দৃঢ়সংলগ্ন, মহা দৃঢ়চিত্তের লক্ষণ। তাঁহার পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি,

অত্যন্ত লম্বা বলিয়া, তাহা প্রায় জানুর নিকট উঠিয়াছে। বস্ত্রখানি অর্দ্ধ মলিন, স্কন্ধে তদ্রূপ এক-খানি উত্তরীয় জড়সড় করিয়া রাখা। উত্তরীয় প্রান্তে নানাবিধ দ্রব্যের নমুনা ছোট বড় অনেকগুলি পুঁটুলি। বৈভবের মধ্যে তৎকালীন হিন্দুত্বের লক্ষণস্বরূপ গল-দেশে সোনার দানা। হস্তে স্বর্ণ না থাকিলে হিন্দুর স্পৃষ্ট জল শুদ্ধ হয় না; সুতরাং একটী সোনার আঙ্গটীও তাহার দক্ষিণ অঙ্গুলীতে ছিল; বৈভবের মধ্যে এই দুই বস্তু। পায়ে একজোড়া ছিন্ন নাগরা চটি, তাহাতে ধুলাই বা কত। অনেক সময় নগ্ন পদেই বেড়াইতেন; তাহার উপর কথার আজিও ছেলেমানুষী আড় ভাঙ্গে নাই, সে কেমন আঁকা বাঁকা উচ্চারণ, তাহার জোড়া মেলা কি উদাহরণ দেওয়া ভার।

মহাজন কলিকাতার কোন উপনগরের লোক; পূর্ণ সহুরে; আকৃতি ত ভালই, ফিরিয়া এক-বারও দেখিতে হয়; তদুপরি বর্ণটী গৌর, সোনায় সোহাগা। তাঁহার পরিধানে পরিষ্কার বস্ত্রাদি, বেশ সুন্দর বেশভূষা; পান্তিকে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—কে একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত

দালালি করিবার অভিপ্রায়ে নূতন কলিকাতায় আসিয়াছে। লোকটি স্বভাবতই একটু রঙ্গ রসের মানুষ; একটু আমোদপ্রিয়, সকল কাজেই একটু লঘুচেতা, সকল জিনিষই একটু রঁসাল করিয়া লইতে চাহেন; এবং তাহা করিবার তাঁহার ক্ষমতাও বেশ আছে। এক কথায় বলিতে গেলে, লোকটী 'মোজলিসী'। তিনি ভাবিলেন, "পাড়াগেঁয়েটার সঙ্গে একটু রস করি। ও আবার মালের খরিদ্দার পাবে কোথায়!" এই ভাবিয়া পান্তির প্রশ্নের উত্তরে যে মালের বাজারদর পাঁচ টাকা, তাহার দর দুটাকা বলিলেন।

পান্তির মুখের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইল। তিনি বলিলেন; "সে কি মোশাই? বাজারে এর দর পাঁচ টাকা, আপুনি দুটাকা কি বলচেন?"

মহাজন কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলেন; "বাপু আমি তা জানি। বাজারে যে দরই হোগ্ আমি তোমায় দুটাকায় দেব, তুমি নেবে?"

কৃষ্ণচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন; "আজ্ঞে মোশাই, ওদরে দেও ত কেন না লিব? তবে মুই পষ্ট কথাই কইছি,

ওদরে মোশায়ের নোকসান হবেই হবে। আপনকার দুটাকার কমে কেনা লেই যে দুটাকায় দিবে।"

মহাজন; "নিশ্চিত আছে, নইলে তোমায় কি ওদরে দিতে পারি। তুমি বাপু দুটাকা দরে নিতে পার ত বল, নইলে বাজে কথার সময় নেই। আমি যখন দিচ্চি, আর তুমি হাতে হাতে দুনো দরে বেচতে পার, তখুন তোমার মাল খরিদে আপত্তি কি? কিনে নিতে চাও ত আমি সমস্ত মাল এখুনি ছেড়ে দিতে রাজি আছি।"

পান্তি আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন; "তা মোশাই যদি মোশার মাল গঙ্গার জলে ঢেলে দেও, মোর তাতে আপত্তি কি? মুই মাল পেলি কেন না লিব? তবে মোশার পাচে নোকসান হয়, বাজার দর জানা না থাকে, শেষে একটা গোল হবে, তাই বলছিলাম ওদরে নোকসান হবে।"

মহাজন; "বলি, আমি মাল বেচব কত্তা; তুমি কেন সুবিধে পেয়ে বায়নাটা কোরে ফেল না? এত তর্ক যুক্তি কেন? তুমি যেমন আমার লোকসানটা ভাবচ, আমি তেমনি তোমার মুনফাটা দেখ্চি। আর মোশাই এমনি বোকচন্দ্র, আমি

মহাজন বেচোয়াল, আমায় কি না লোকসান হবে বলে ভয় দেখাচ্ছ। তুমি নিজের গণ্ডা বোঝ ত এখুনি বায়না কর।”

“কৃষ্ণচন্দ্র ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া আপনার অঙ্গুরিয়টি মহাজনের হস্তে দিয়া প্রস্তাব করিলেন; “মুই এইটে দিয়ে বায়না করলাম। আর মাল ওজনের তরে এখুনি নোকজন পাঠাচ্ছি; ট্যাকাও পাঠাচ্ছি।” পান্তি এই বলিয়া নাগরা ফট্ ফট্ করিতে করিতে নিজের গদিতে যাইবার জন্য দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় মহাজন তাহাকে ডাকিলেন। পান্তি মনে করিলেন, বুঝি মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মহাজন; “কৈ বাপু, মাল কত, কত টাকা পাঠাবে তা কিছুই জিজ্ঞেস না কোরে চলে যাচ্চ?”

কৃষ্ণ বিনীত স্বরে; “আজ্ঞে তা সুদ্ধুবার দরকার লেই। মুই যখন বলিছি সব লিব, মাল যেমন যেমন ওজন হবা, কিস্তি পিছু দাম দিব তবে মোশায় মাল ছাড়বে। ওর আর আগে হিসাব কি?” এই বলিয়া পান্তি চলিয়া গেলেন।

পান্তি গমন করিলে একজন দালাল মহাজনের

নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদেশীয় উচ্চারণে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল; "মশয় কি বর করতারে চিন্নেন?"

মহাজন—কে বড় কর্ত্তা?

দালাল—ঐ জিনি মশয়ের কাছ থেইকে চইলা গেলেন।

মহাজন—আরে ওটা কে পাগ্‌লা এসেছিল, মাল খরিদ করতে। তা আমি ওকে দুটাকা দরে মাল দেব বলিচি। মহালোভে পড়ে এই আঙ্‌টিটে দিয়ে বায়না কোরে' গেছে। আঙ্‌টীটেই লাভ।"

দালাল—মশয় যে আইশ্চর্য্য কইরলেন। এ বাজারে দুই ট্যাকা দড়ে মাল ছাইরবেন বইলা বায়না নিচ্যান! আপনার কি খুব মাটির দড়ে করিদ আছে?" দেখিতে দেখিতে অনেক পূর্ব্বদেশীয় কয়াল দালাল কিস্তির নিকট উপস্থিত হইল।

মহাজন ব্যঙ্গসূচক উচ্চ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন; "আরে ক্ষেপেছ রামচন্দ্র। ওটা মুটের সর্দ্দার, দালালি আরম্ভ করেচে। সস্তা শুনে, লোভে লোভে বলে কি না সব মাল খরিদ কর্ব্বে; ক্ষ্যামতা ভারি। এই আঙটীটেই লাভ।' তুমি কি ভেবেছ ও আবার ফিরে আসবে? মনেও কোরনা।

টাকা কোথা পাবে ?”

রামচন্দ্র উত্তর করিবার পূর্ব্বেই একজন কয়াল তাড়াতাড়ি বলিল ; “বলেন কি মুশয়, বর করতারে চিন্যান না ?”

রামচন্দ্র ; “মুশয়, বরই বুল কইরচ্যান, বরই বুল কইরচ্যান। আগে বায়না নিয়া ফেলাইচ্যান, আর এহন আপোনারে ঐ দরে সমস্ত মাল ছাইরতে বাইধ্য কইর্ব্বে। আপোনার মালের কথা কইচ্যান কি, উনি ইচ্ছা কইর্ল্যে হাইটখোলায় জত মাল আছে সবই লগদ ট্যাকায় করিদ কইর্তে পারেন। ক্যাষ্ট বাস্তি কত বর দনী তা বুঝি মুশয় জান্যান না ?”

মহাজন এখন একটু বিস্মিত হইয়া রাম দালালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; “কেন বলত ? তোমরা কি ওকে চেন নাকি ?”

দালাল ; “হাইটখোলায় বর করতারে কে না চিন্যা ?” কায়াল দালাল অনেকেই উপস্থিত ছিল। একজন বলিল ; “ক্যাষ্ট বাস্তিরে সকলেই চিন্যা ; আপনি চিন্যান না, বরই আইশ্চর্য্য কথা !”

সকলেই এই প্রকার বলাতে মহাজনের মনে বিষম ভয় উপস্থিত হইল। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "হ্যাঁগা, দালাল মশাই, ঐ নিটকেল চেহারাটি কি কেষ্ট পান্তি? সত্যি না কি?"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল; "আজ্ঞা হঁ, মশয়, ক্যাষ্ট বান্তি।"

মহাজন যে সমূহ বিপদগ্রস্থ তাহা এখন তাঁহার বেশ বোধগম্য হইল। তিনি ব্যগ্রভাবে রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তবে মশাই এখন উপায়?" ইতিমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের লোকজন কয়াল সরকার এবং দ্বারবানেরা তোড়া তোড়া টাকা স্কন্ধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মহাজনকে মাল রপ্তানি দিতে বলিল। মহাজন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন; ভাবিলেন; "একি, কেঁচো খুঁড়তে কাল সাপ বেরুল, শুকন ডেঙ্গায় ভরা ডুবি করলুম!" হতভাগ্য মহাজন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কৃষ্ণপান্তির লোক-জনের হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন।

তাহারা বলিল; "মশাই আমাদের কোনই ক্ষমতা নেই। আমরা কত্তার হুকুম তামিল করতে এসেছি। ঐ দেখুন দরোয়ানেরা টাকার তোড়াও এনেচে। আপনি এখনি টাকা চেয়েচেন।"

মহাজন কৃতাঞ্জলিপুটে অতীব কাতর স্বরে সরকারদিগকে বলিলেন; "সরকার মশাই, আমায় বাঁচান, নইলে আমার সব যাবে। আমি এই অল্পদিন মাত্র কারবার আরম্ভ করেছি। বড় কত্তাকে চিনিনি। সামান্য একজন দালাল মনে কোরে এই বিষম বিপদ ঘটিয়েছি। আমার অপরাধ হয়েছে, স্বীকার করছি; আপনারা তাঁর এই আঙটিটি নিয়ে যান, আমি ওদরে মাল ছাড়লে মারা যাব!"

সরকার; "আমরা কিছুই করতে পারব না। ও আঙটী আপনি নিয়ে তাঁর গদিতে যান। আমাদের সাধ্যি নেই তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে। তবে এই মাত্তর আপনাকে বলছি যে তিনি লোক খুবই ভাল, যদি বোঝেন যে এদরে মাল নিলে আপনার সব্বনাশ হবে, তাহলে হয়ত ছেড়ে দিতে পারেন। তাঁর মেজাজ খুব উঁচু দরের; লোকের অনিষ্ট করতে বড়ই নারাজ।"

মহাজন নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া ঐ দালালদিগের সহিত দ্রুতগমনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে পান্তির গদিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই

কৃষ্ণকায় লোকটি গদিতে উপবিষ্ট, এবং তাঁহার মুখে রাজগাম্ভীর্য্য বিত্তমান। মহাজন তাঁহাকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া কহিলেন; "মশাই, আমার অপরাধ হয়েছে। অমি কার সঙ্গে ঠাট্টা করিছিলুম জানতুম না। এই নিন আপনার আংটী। আর আমার অপরাধের জন্যে যদি কিছু জরিমানা করেন ত তাও দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনার বায়না থেকে আমায় অব্যাহতি দিন। ওদরে মাল দিলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। এই ছমাস মাত্তর ব্যবসা কোরে আমার পুঁজি-পাটা যা হয়েছে সবই যাবে, মশাই।"

কৃষ্ণচন্দ্র নম্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন; "মোশাই কারবারের কথায় ঠাট্টা করেছ, মুই তা কেমন কোরে বুঝব? মুইত উবিস্থিত বাজার দর মোশাইকে বলিচি। তাতেও মোশাই ঐ দরে মাল ছাড়তি রাজি হয়েছ, তবে ত মুই মোশাইকে বায়না দিইচি আর আপুনি সেই বায়না লিয়েচ। মাল দেবার সময় এখন ওকথা বললি- চল্‌বে কেন? মহাজনের কেনা বেচায় আবার ঠাট্টা কি? মুই ত ওকথা বুঝি না। আর যখন বায়না করিচি,

তখন মাল ছাড়ব না, মোশাই। আপুনি হয়ত মোর কথায় বাজার দরটা তখন বিশ্বাস করোনি, মোশায়ের খুব কমে খরিদ ছিল, তাই দুটাকাতে দিয়ে ছিলে; এখুন অনেক দালাল টালালের মুখে বাজার দরটা বুঝে বেশী মুনফার চেষ্টা করচ। এটা ভাগ নয়, মোশাই। কারবারী নোকের পক্ষে বড় নিন্দের কথা, নেহাত অধম্মের কথা। মুই ওসব বাজে কথা শুনব না মোশাই; আপুনি যাও, মাল ছেড়ে দিয়ে টাকা চুকিয়ে লিওগা।”

কৃষ্ণচন্দ্রের দৃঢ় বাক্যে মহাজন হতাশ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি রোদন করিতে করিতে পান্তি মহাশয়ের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। কৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া পদদ্বয় অপসারিত করিয়া বলিলেন; “একি মোশাই, আপুনি দেখচি বয়সে ছেলে মানুষ, কাজেও তাই! কি দু পয়সা বেশী নাভের, তরে এত হীন হচ্চো কেন? কারবারী মানুষের মত ব্যাভার কর। পুরুষ মানুষের মত কাজ কর। মহাজনের কেনা বেচায়

নাভ নোকসান আছে। আশার চেয়ে কম নাভ হয়, কখন বা হয়ত অনেক নোকসানও হয়, তাতে কান্না হাটি আবার পায়ে ধরাধরি কি? আশ্চর্য্য! আপুনি দেখচি ভদ্দর সন্তান। ভদ্দর সন্তান হয়ে, মুই পান্তি, মোর পায়ে ধর্‌তে মোশায়ের একটু কিন্তু বোধ হল না।”

মহাজন পান্তির ভ্রূকুটি ও বাক্যবাণে একটু দৃঢ় হইয়া লজ্জাবনত মস্তকে, ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিয়া উত্তর করিলেন; “আপনি ঠিক বলেছেন, আমার বিচলিত হওয়া উচিত হয় নি। তবে কি জানেন আমি হাল্‌কা লোকের মত আপনাকে সামান্য লোক মনে করেছিলুম। মাল খরিদের বিষয় আপনার ওপর আমার এক তিলও বিশ্বাস হয়নি, তাই আপনাকে একটু তাচ্ছিল্য করবার মতলবেই আমি এত কম দর বলেছিলুম। ভেবে-ছিলুম আপনি এত মাল কেনবার টাকা কোথা পাবেন। আঙ্‌টীটাই হয়ত ফেলে পালাবেন, নয়ত আমার হাতে পায়ে ধরে বায়নাটা ফেরত নেবেন। এই কুচিন্তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যেই আমি মশায়ের পায়ে ধরেছি। তবে আপনার যদি

আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ত লোক দিয়ে আমার খাতাগুলো নৌক থেকে আনান্ দেখুন ঐ মাল চার টাকা বার আনা হিসেবে কেনা আছে কি না। খাতা দেখ্‌লেই বুঝবেন যে আমি হীন ভাবে বেশী লাভ করবার মতলব কর্‌ছিলুম, কি সত্যি সত্যিই ঠাট্টা করিছিলুম।”

কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন; “এ বেশ কথা। ওরে একজন এই কত্তা মোশায়ের নৌক থেকে খাতাগুলো চেয়ে নিয়ায় ত।”

একজন কর্ম্মচারী মহাজনের নিকট হইতে একখণ্ড লিপি লিখাইয়া তৎক্ষণাৎ খাতা আনয়ন করিতে গেল। পান্তি মহাজনকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করাতে মহাজন একটু অন্তরে কর্ম্মচারীদিগের আসনে উপবেশন করিতে যাইতে ছিলেন; অমনি কৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের সহিত বসিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন; “ওকি মোশাই আপুনি আর মুই কোন পেরভেদ আছে কি? মুইও মহাজন, আপুনিও মহাজন, এই খানেই বসুন। ওরে কত্তা মোশাইকে তামুক দে।” এই বলিয়া পান্তি একবার কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

ইতি মধ্যে মহাজনের খাতা আনীত হইল। পান্তি পুনরাগমন করিয়া মহাজনের নিকট বসিলেন। মহাজন খাতা খুলিয়া তাঁহাকে খরিদের দর দেখাইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন; "মোশাই মুই মুখখু মানুষ নেকা পড়া জানিনা। যুগোল, দেখলে ত কি ব্যাপার।" মহাজন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; যে খাতা দেখিতে পারে না এরূপ মূর্খ মানুষ সে কিরূপে এতটা কারবার চালায়।

আড়ংঘাটা নিবাসী যুগোল কিশোর মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ এবং হাটখোলার গদিদার, অর্থাৎ টাকা মাল প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার অধীন। তিনি খাতা দেখিয়া বলিলেন; "আজ্ঞে চার টাকা বার অনাতেই খরিদ আছে।"

পান্তি—"কোন তারিখ?" এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে তারিখ ওয়ারি সকল দ্রব্যের বিগত দর তাঁহার কণ্ঠস্থ।

যুগল তারিখ বলিলে, পান্তি মনে মনে তাহা মিলাইয়া লইয়া বলিলেন; "হুঁ তা ঠিক্। কিন্তু আপুনি মহাজনি করবে কি করে? আপুনি এমনি ছেলে মানুষ যে কেনা বেচার কথায় ঠাট্টা

গোঁদেল কর। আজ যদি আর কারুর হাতে, পোড়তে ত কি হোত মোশাই? আর এই ছেলে-মানুষীর তরে মোশাইকে কতটা হীন হতে হল একবার ভেবে দেখ দিকি। আপুনি নিহাত ছেলে মানুষ। তবে আজ মোশায়ের চোক ফুট্‌ল। আপুনি ইংলিজি পরা লোক, সব বোঝো; এটা মান না যে কথাই ভগবান, শাস্তোরে বলে নাকি শব্দ ব্রেম্ম। মুই ত মনে করি এটা ঠিক কতা; কতার মধ্যিও তিনি আছেন। তিনি নেই কোতা? তাই সব কতা ভেবে চিস্তে কইতে হয়।” এই বলিয়া প্রত্যর্পিত অঙ্গুরীয় লইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী-দিগকে মহাজনের মালের উপর কোন প্রকার দাবী করিতে নিষেধ এবং স্বীয় লোক জনকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন।

মহাজনটী সত্যই শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। তিনি লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন; এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন যে ব্যবসায় তুচ্ছ কথা আর প্রাণান্তেও কহিবেন না।

কোন স্থানে অগ্নি লাগিলে যেমন সে সংবাদটী

গ্রামময় অথবা নগরময় সত্বর বিস্তৃত হইয়া পড়ে, হাটখোলায় বড় কর্ত্তার এই অপূর্ব্ব ঘটনার সংবাদ নানা প্রকার শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া তদ্রূপ চতুর্দ্দিক রাষ্ট্র হইল। যে কেহ কৃষ্ণপান্তিকে না জানিত এখন সেও তাঁহাকে চিনিল, এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

লবণের কারবারে পান্তির আধিপত্য এরূপ হইল যে এখন (Salt Board) লবণ বিভাগের শ্বেতাঙ্গ (Secretary) সচিব পান্তি মহাশয়ের সহিত সসম্ভ্রমে কথা কহেন। সমস্ত ক্রেতাগণ নিলামের সময় সেই স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু পান্তির অনাগমন পর্য্যন্ত সচিব নিলাম আরম্ভ করেন না। ক্রেতাগণের উপবেশনার্থ ঘরে কয়েকখানি বেঞ্চি আছে। সকলেই তাহাতে উপবেশন করেন, কৃষ্ণও বসেন। লাভের পরিমাণ যত বেশী হয়, কৃষ্ণ টাকা সংগ্রহ করিয়া ততই বেশী পরিমাণ লবণ ক্রয় করেন। সেই জন্য সময় সময় টাকা কর্জ্জও করিতে হয়। ইতঃপূর্ব্বে এত অধিক পরিমাণ লবণ কোন মহাজনই

একলাটে একডাকে ক্রয় করিতে পারেন নাই। সুতরাং লবণ বিভাগের নিম্ন শ্রেণীর সামান্য কর্ম্মচারী হইতে শ্বেতাঙ্গ সচিবের নিকট পর্য্যন্ত পান্তির সম্মানের সীমা পরিসীমা নাই।* এমন কি পান্তি মহাশয় নিলাম গৃহে উপস্থিত হইলে নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সচিবের সমীপে লইয়া যায় এবং সচিবও তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক নিজ পার্শ্বে তাঁহাকে আসন দেন। ক্রমে লবণের সকল কর্ম্মচারীই কৃষ্ণের অনুগত হইয়া পড়িল।

এক দিবস কৃষ্ণ সংবাদ পাইলেন যে অদ্য বেলা এগারটার সময় লবণের অত্যন্ত বড় বড় লাট বিক্রয় হইবে। পান্তির হস্তে কিন্তু টাকা নাই। কলিকাতার অন্তর্গত শিমুলিয়াতে রামদুলাল সরকারের তেজারতি ব্যবসা এই সময় অসীম বিস্তৃত। তাঁহার অপেক্ষা বড় মহাজন এখন আর কেহই নাই। প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে দশ বিশ ত্রিশ লক্ষ বা ততোধিক টাকার আদান প্রদান হয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ বড় বড় জমিদার তাঁহার

অধমর্ণ। পান্তি কলিকাতার ব্যাপার সবই জানেন, তিনি ভাবিলেন, "আমদুলাল সরকারের সঙ্গে টাকার লেন দেনটা খুলতে পারলি নুনের কাজটা খুব বাড়তি পারে।" কৃষ্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিলেন যে রামদুলাল সরকারের সঙ্গে বেলা তিনটার সময় নিভৃতে সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আজি আর নিলামে যাওয়া হয় না। "তা একদিন না হয় নাই হল। আজ মহাজনটা ঠিক করি, তার পর দেখা যাবে।" এই চিন্তা করিয়া সেদিন নিলামে না যাইয়া বেলা তিনটার সময় রামদুলাল সরকারের বাটী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর দালানের সোপানোপরি এক জন বেশ সুশ্রী অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ বসিয়া ধূমপান করিতেছে। পান্তি ব্রাহ্মণকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া তাহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, সে সরকার বাটীর পাচক ; রন্ধনাদি কার্য্য শেষ করিয়া এই মাত্র ছুটি অন্ন উদরস্থ করিয়া ধূম পানের সুখভোগ করিতেছে।

পান্তি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "ঠাকুর, কর্ত্তামোশাই কোথায় ? তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

"কর্ত্তা মশায়ের কাছে কত গাড়ী-জুড়ী-চড়া বড় লোক আসে, এমন সামান্য লোকের সঙ্গে কি কর্ত্তা দেখা করবেন?" এইরূপ চিন্তা করিয়া পান্তির প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ মনোযোগ না করিয়া বলিল, "কর্ত্তা মশাই এখন আহারের পর বিশ্রাম করছেন। হয়ত ঘুমিয়েছেন। এখন ত দেখা হবে না। তোমার কি দরকার?" ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিল, এ এক জন ভিক্ষার্থী।

কৃষ্ণ পান্তি মানুষের জহুরী। তিনি ব্রাহ্মণের কথার অর্থ ঠিক বুঝিয়া অতি মিষ্ট ভাবে বলিলেন, "সে কথা ত কর্ত্তা মোশায়ের সঙ্গেই হবা। তুমি ঠাকুর একটু কষ্ট কোরে দেখ তিনি ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। যদি না ঘুমিয়ে থাকে বোলো রাণাঘাটের কেষ্ট পান্তি এসেছে, আপনকার সাতে আলাপ করবে।"

নাম শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ হুঁকাটা তাড়াতাড়ি পার্শ্বে রাখিয়া উঠিয়া খবর দিতে ছুটিল। হুঁকা গড়াইয়া পড়িয়া গেল; কৃষ্ণ অমনি হুঁকাটী ধরিয়া তাহাতে কলিকাটী পরাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যা-

গমন করিয়া হুঁকা তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া নিজে যথাস্থানে স্থাপন করিল; তৎপর পুনরায় ছুটিল। পান্তি ব্রাহ্মণের ভাব দেখিয়া একটু মৃদু হাঁসিয়া সেই স্থানেই পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে কর্ত্তা মহাশয় ডাকিলেন; "পাল মশাই নমস্কার, আসুন, আসুন, বড় সৌভাগ্য, আপনার পায়ের ধুলো পড়লো; আসুন, ওপরে আসুন।" অমনি এক জন দ্বারবান শশব্যস্তে পান্তিকে পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল।

দ্বিতলে উপস্থিত হইলে সরকার মহাশয় তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া স্বীয় উচ্চ শয্যাপরি বসাইতে চেষ্টা করিলেন। পান্তি কিছুতেই সে স্থানে বসিলেন না; বলিলেন; "মোশাই আপনকার সাথে এক বিছানায় বস্‌বার লায়েক মুই লই। তার ওপর মুই এসেছি আপনকার খাতক হবার তরে। আপনকার সাথে মোর মহাজন খাতক সুবাদ। মুই কি ওখানে বসতি পারি?"

সরকার মহাশয় মজলিসি হাসি হাসিয়া শারীরিক

আয়তন মত গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন; "আপনার সঙ্গে কথায় পারব না। তবে আমিও এইখানে বসি। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমাকে মশায়ের মহাজন করতে এসেচেন। এতে আপনি আমার মানটা খুবই বাড়িয়ে দিলেন। আপনার মত খাতক পেলে মহাজনের বিশেষ গৌরব আছে। তা বেশ মশাই, আপনি হুকুম করুন আমায় কি করতে হবে।"

পান্তি করজোড়ে হাস্য মুখে কহিলেন; "আজ্ঞে, তা নয় আপুনি হুকুম কর, মুই যেন কিছু কর্জ্জ পাই।"

এই কথা শুনিয়া কর্ত্তা মহাশয় আরও উচ্চৈঃ-স্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন; "আমি আগেই বলেছি আপনার সঙ্গে কথায় কারুর পারবার যো নেই। তা বেশ আপনার কত টাকার আবশ্যক তা হুকুম করুন।" সরকার মহাশয় ভাবিলেন কৃষ্ণচন্দ্র একেবারে হয়ত বিশ ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা চাহিবেন, বেশী চাহিলে একদিনে যদি না দিতে পারেন তাই আরও জিজ্ঞাসা করিলেন; "আর কবে চাই।"

কৃষ্ণপান্তি মানুষের মনের ভাব ঠিক অনুমান করিতে পারেন। তিনি বলিলেন; "আজ্ঞে শুনচি মুনের একটা খুব বড় নাট না কি বিক্রী হবে। মোর ট্যাকায় যদি না কুলয় তবেই কিছু সামান্যি ট্যাকার আবিশ্যক হতি পারে। তা বেশী নয়, বড় জোর তিন কি চার নক্ষি ট্যাকা হলেই হতি পারে। আর সেটা কাল মোশাইকে বোলে পাঠাব; পরশু বেলা বারটার সময় পেলি চল্‌বে।"

সরকার মহাশয় দেখিলেন যে পান্তি প্রথমেই বেশী টাকার ঝুঁকিটা চাপাইলেন না। সুতরাং পান্তির সহিত কারবার করিতে তাঁহার সাহসটা অটুট রহিল। তিনি বলিলেন; "তবে পোরশু বেলা দশটার সময় একেবারে টাকা নিতে লোক পাঠিয়ে দেবেন। যা দরকার নিয়ে যাবে। আপনাকে কষ্ট কোরে আর আগে খবর দিতে হবে না।"

সরকার মহাশয় জমিদারী বন্ধক রাখিয়া বেশী সুদেই অধিক টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন, সুতরাং পান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন; "সকল কথা খোলসা বলা ভাল। তা সরকার মোশাই ব্যাজটা কত

পড়বে ?”

“আজ্ঞে আমিও বলি খোলসা কথা নইলে শেষে গোল হয়।” এই বলিয়া সরকার মহাশয় উত্তর করিলেন ; “আপনি ঠিক বলেছেন। আমি জমিদারী রাখি বেশী সুদে; কারণ তাতে টাকাটা পাল্‌টায় না, আট্‌কে থাকে, তার ওপর মালি মোকর্দ্দমা, ভাগ বাঁটোয়ারা, মেলা ছেঁড়ালেটার হেঙ্গামা আছে, তাই বেশী সুদ দরকার হয়ে পড়ে। আপনার সঙ্গে কারবারে টাকা আটকাবে না, পাল্‌টাবে, আর কোনই হেঙ্গাম নাই। আপনি মহাজনী কারবারের বাজার দর মত সুদ দেবেন।”

পাণ্ডি এই কথায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় সরকার মহাশয়ের পাচক ব্রাহ্মণকে সিঁড়িতে দেখিতে পাইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া নিকটে আনিয়া চুপি চুপি বলিলেন ; “কি দরকার তা ত শুন্‌লে ঠাকুর ? এখুন দয়া কোরে মোদের ওখানে একদিন পায়ের ধূলো দেবা ?”

ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে জোড় হস্তে বলিল ; “সেকি মোশাই, আপনি হুকুম করলেই যাব।”

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাস্তি গদিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যুগলকিশোর খদিদার মহাশয় জানাইলেন যে লবণের আপিসের এক জন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন। পাস্তি অবনত মস্তকে এক মনে তাম্রকূট সেবনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মস্তক উত্তোলন না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

যুগল—"সেক্রেটারী বোলে পাঠিয়েছে, আপনি হাজির হোলেন না বোলে নিলাম বন্ধ রাখা হয়েছে। কাল বেলা এগারটার সময় আপনি হাজির হন ত হবে, নইলে কালও বন্ধ থাকবে।"

পাস্তি সেই ভাবেই আবার প্রশ্ন করিলেন; "আর কোন কথা তোমায় সুধিয়েছিল?"

খাজাঞ্চি—"আজ্ঞে হাঁ, আপনার কেন আজ যাওয়া হয়নি, শরীর কেমন আছে?"

পাস্তি এইবার কর্ম্মচারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কি জবাব দিলে?"

যুগল;—"আজ্ঞে আমি বললাম, তাঁর শরীর ভাল আছে, তবে কেন নিলেমে যান নি তা জানি না। একটা কোন বিশেষ কাজে অন্যত্র গিয়েছেন।"

কৃষ্ণ; "আর কিছু বলল?"

যুগল; "আজ্ঞে না।"

পরদিন একটী সুবৃহৎ লাট ক্রয় করা হইল। তৎপরদিন সরকার বাটী হইতে আবশ্যক মত টাকা আনাইলেন। এই লাটেই অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ হইল। পান্তি মহাশয় একদিন বৈকালে একজন সরকারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন; "হাঁগা তুমি ছুলোল সরকারের বাড়ী জান? ট্যাকা আন্‌তে তুমি গিছিলে?"

সরকার; "আজ্ঞে না, শুনিচি শিমলেতে। সরকার হয়ত খুঁজে নিতে পারব।"

পান্তি; "তা যদি পার ত একটা কাজ কর। সরকার বাড়ীর আঁহুনি বামুনঠাকুরকে সেদিন বলে ছিলাম একদিন এখানে এসে পায়ের ধুলো দিতি। তা কৈ আজো ত এল না। তুমি একবার ছেলেটীরে ডেকে আন, এখানে এসে জলযোগ

ক’রে দিয়েছেন। কত লোককে এক একটা গদির ভার দিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছেন ; তারা রাজার হালে আছে ; তেমনি রোজকারও করছে। আপনি লিখতে পড়তে জানেন ?”

ব্রাহ্মণের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, সে বলিল ; “বড় বেশী নয় ; তবে আমার মনে হয় দিন কতক অবেস করলে লেখাটা পাকিয়ে ফেলতে পারি। তা পাস্তি মশাই যদি একটা সরকারী টরকারী দেন ত আগুনতাতের হাঁত থেকে বেঁচে যাই, মশাই। তবে লেখা ; তা কি জানেন, মানুষ লিখতে লিখতে লিকিয়ে হয়, কেবল কানায়ে ঠেললে ত হাতের লেখা পাকে না ; পাস্তি মশাই কানায়ে ঠেলা থেকে বাঁচান ত ভাল হয় ; বেঁচে যাই, বেঁচে যাই।”

সরকার—“দেখুন, আপনার অদেষ্টে কি হয়।”

ব্রাহ্মণ—“আচ্ছা আপনাদের কত্তা মশাই খুব ভাল লোক, না ? আমার ত মনে হয়, এমন অমায়িক মানুষ আর হবে না।”

সরকার ; “আপনি ঠিক বলেছেন। আজ প্রায় দশ বচ্ছর পাস্তি কত্তার কাছে চাঁকরী কচ্ছি। কত সময় কত অপরাধ করিচি, কিন্তু, মশাই, কিছুতেই

কর্ত্তার রাগ কি মেজাজ খারাপ দেখিনি। আমাদের মনে হয় কর্ত্তা মশাই আমাদের মা বাপ; কত সময়ে কত আবদার শোনেন; দায়ে পড়লে, তখুনি উদ্ধার করেন। মাইনে কম পাই বটে, কিন্তু বার মাসে তের পার্ব্বনে সবাইকে, যে যেমন তারে তেমনি, দেওয়া আছে। মেয়ে ছেলের বে, বাপ মার শ্রাদ্ধ, আরাম ব্যায়রাম, এতে কর্ম্মচারীর একপয়সা খরচ নেই, সব হিসেব কোরে কর্ত্তা দেন। আমরা যেন সব তাঁর পারিবার ভুক্ত।"

শিমুলিয়া হইতে হাটখোলা বেশী দূর নহে। দুজনে এইরূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত। কর্ত্তা দালানে ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণাম পূর্ব্বক তাহার হস্তপদ ধৌত করাইয়া একখানি আসনে বসাইলেন। তৎপর কক্ষান্তরে গমন করিয়া নিজের সিন্দুক খুলিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্ব সময়েই কয়েক জোড়া গরদের কাপড় থাকিত। কর্ত্তা স্বয়ং কিন্তু খেঁটে পরিয়া পূজা করেন। সিন্দুক হইতে একখানি গরদের কাপড় ও উত্তরীয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণকে পরিধান করাইলেন। একজন লোক একখানি থালায় মিষ্টান্ন ফল মূল ও একটী

পাত্রে সর্ব্বৎ লইয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে স্থাপন করিল। পান্তি করজোড়ে বলিলেন; "সেবা হোগ।"

ব্রাহ্মণ জলযোগ করিতেছে আর পান্তি কর্ত্তা তাহার নিকট বসিয়া তাহার বিষয় জ্ঞাতব্য সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার বাটী কোথায়; বাটীতে কে কে আছে; তাহারা কয় ভাই; পিতা মাতা জীবিত আছেন কি না ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ভৃত্যেরা হাজার টাকার দুই তোড়া আনিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিয়া গেল।

পান্তিকর্ত্তা সহাস্য বদনে বলিলেন; "ঠাকুর সেই দিনই মনে করেছিলাম তোমায় কিছু দিব। তা এই দু হাজার ট্যাকা নিয়ে দেশে জমি জেরাত করোগা, ঠাকুর দেবতার সেবা করগা; চাকুরী আর কোরো না। বামনের ছেলের যা কাজ তাই করগা।"

ব্রাহ্মণ ব্যাপার দেখিয়া ও এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সে একবার তোড়াগুলির প্রতি, একবার পান্তির সহাস্য বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল; "ইনি কে; মানুষ না দেবতা, না আর

জন্মে আমার কেউ ছেলেন? আপনারজন্যও ত কেউ এমন উপকার করে না। বাবার শ্রাদ্ধর সময়, দোরে দোরে কেঁদে বেড়িয়েছি, আত্মীয়রা সাহায্য করা চুলয় যাক, কেউ একবার আহা বোলে উঁকিটেও মেরে দেখলে না। আর ইনি আমায় এত টাকা একেবারে দিয়ে ফেললেন !!! এঁর না জানি কত টাকা! আমি কিন্তু এতটা টাকা সামলাব কেমন কোরে?”

কৃষ্ণ; “অ ঠাকুর ভাবচ কি, যা বল্লাম শুনলে?”

ব্রাহ্মণ; “আজ্ঞে হঁা, শুনলাম। কিন্তু এতটা টাকা আমি কোথায় রাখব তাই ভাবছি।”

কৃষ্ণ; “তার আর ভাবনা কি? ট্যাকাগুলি তোমার মুনিব বাড়ী গচ্ছিত রাখগা, আর দেশে গে সুবিধে মত জমি জেরাত যেমন পাবা তেমনি ট্যাকা নিয়ে যাবা।”

ব্রাহ্মণ; “আজ্ঞে তাই করব, আর আপনার কাছে এসে পরামর্শ নেব।”

কৃষ্ণ; “ভয় কি ঠাকুর, নারাণ ঠিক পরামর্শ দিবে, ঠিক বুদ্ধি দিবে কারুর সঙ্গে সল্লা করতি হবা না। তবে মধ্যি মধ্যি ইচ্ছে হয় ত এখানে পার ধুল দেবা।”

হৃদয়ের উদ্বেগে ব্রাহ্মণের জলযোগ করা আর হইল না; সে প্রায় কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিল না, সুতরাং উঠিয়া হস্ত ধৌত করিল। পাস্তি একটু বিস্মিত হইয়া আর কিছু আহার করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তখন স্বপ্নসিন্ধু মাঝে ভাসমান; সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার সম্মুখে ঘুর্ণায়মান, কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব অসুস্থতা অনুভব করিয়া, তাহার আহারে আর রুচি হইল না। অবশেষে পাস্তি কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা একখানি ভাড়া গাড়ী করিয়া লোক সঙ্গে দিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার মনিববাটী পৌঁছিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণকে যে সরকার সঙ্গে করিয়া আনয়ন করিয়াছিল, সে ব্রাহ্মণকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়া বলিল; "কি ঠাকুর মনে কোরেছেলে একটা সরকারী কাজ পেলেও বেঁচে যাবে। এখন যাও ঘরে গিয়ে নিজে একটা সরকার বাহাল কর গে, কত্তার কৃপায় যা পেলে, তাতে পুরুষোপুরষী বোসে খাবে, আর বুদ্ধি থাকে ত কত বেড়াবে।"

ব্রাহ্মণ এখনও সম্পূর্ণ স্বপ্নরাজ্যে, সুতরাং ধীরে ধীরে উত্তর করিল; "ভাই আমি যেন সব স্বপন দেখছি। আমার মাথা ঘুরছে, শরীর যেন কেমন কোর্‌ছে।" এই বলিয়া বেচারী আস্তে আস্তে গাড়ীতে উঠিয়া এলাইয়া পড়িল। টাকার তোড়া দুটী গাড়ীতে স্থাপিত হইলে ব্রাহ্মণ চুপি চুপি সরকারকে বলিল; "তোমাদের কর্ত্তা মশাই মানুষ না দেবতা, আমি বামুন না হোলে তাঁর পায়ের ধূল নিয়ে আস্‌তুম। আমি নিতে পারি, কিন্তু পাছে কর্ত্তা মনে করেন তাঁর অকল্যাণ করছি।"

কর্ম্মচারী; "তাই বটে, মশাই, তাই বটে, পায়ের ধূলই নিতে ইচ্ছে হয় বই কি?"

গাড়ী চলিয়া গেলে কর্ম্মচারীগণ অগ্র কর্ত্তা মহাশয়ের নূতন প্রকারের সাহস দেখিয়া পরস্পর অনেক কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

এদিকে অতি অল্পদিবসের মধ্যে লবণের ব্যবসা কৃষ্ণপান্তি একপ্রকার একায়ত্ত করিলেন। লবণের সমস্ত লাটগুলি কৃষ্ণচন্দ্র ডাকিয়া ক্রয় করেন, মূল্য পরে ধার্য্য হয়। অপরাপর মহাজনেরা পান্তির নিকট হইতে লবণ ক্রয় করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

কৃষ্ণপান্তি বাণিজ্যোন্নতির দ্রুতগামিস্রোতে পড়িয়া বাটী গমন করিবার অবকাশ বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইবার পাইতেন, রথের সময় দুই তিন দিনের জন্য এবং শারদীয় পূজার সময় ষষ্ঠির দিন প্রাতে বাটী যাইয়া পৌঁছিতেন, ও একাদশীর দিন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতেন। এই দুই বার ব্যতীত আর তাঁহার বাটী যাওয়া প্রায় ঘটিত না। একবার শারদীয় পূজার সময় তিনি ষষ্ঠির দিনও উপস্থিত হইতে না পারিয়া পর দিন প্রাতে উপস্থিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী একদিন বিলম্বে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন; "ওগো, একটা দিন এলাম না বটে, কিন্তু নক্ষি ট্যাকা রোজকার কো্রে রেখে এলাম।"

কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতায় ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দুই তিন বৎসর পরে রথের দুই এক দিন পূর্ব্বে রাণাঘাটে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে তাঁহাদের পর্ণকুটীর ছিল, সে স্থানে এখন অট্টালিকা সুতরাং কৃষ্ণ

জিজ্ঞাসা করিলেন; "হাঁ গা, কেষ্টপান্তি আর শেস্তোদের ঘর কোথা?"

প্রতিবেশীরা উত্তর করিল; "সে কুঁড়ে ত এখন আর নেই; এখন ঐ মস্ত অট্টালিকে করেছে। এত বড় বাড়ী রাণাঘাটে কোন কালে ছেল না।" ব্যবসাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইত তৎসমুদয় কৃষ্ণচন্দ্র শম্ভুভায়ার নিকট প্রেরণ করিতেন। শম্ভু সেই অর্থ দ্বারা তেজারতি করিয়া বহু টাকা উপার্জ্জন করিতেন। ভূমপ্রদি বন্দক রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়াতে ক্রমে রাণাঘাটেই কিছু কিছু জমি সংগৃহীত হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র নিজেদের বসতবাটী ইষ্টকনির্ম্মিত করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ইতিপূর্ব্বে লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যে এত শীঘ্র নির্ম্মিত হইতে পারে তাহা কৃষ্ণ-চন্দ্র মনে করেন নাই। সুতরাং যে স্থলে তাঁহাদের পর্ণকুটীর ছিল তথায় অট্টালিকা দেখিয়া প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়া প্রতিবেশীদিগকে তদ্বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণপান্তি সেই অট্টালিকার প্রবেশ দ্বারে গিয়া দেখিলেন সে স্থানে অনেক লোকজন;

তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "হ্যাঁগা শেঁস্তো ঘরে আছে?"

বাটীর কর্ত্তৃপক্ষকে এবংবিধ সম্বোধন করিতে শুনিয়া সে ব্যক্তি বুঝিল যে ইনি কৃষ্ণপান্তি; সে সত্বর শম্ভুকে সংবাদ দিল। শম্ভু তৎপর আসিয়া গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদধূলি লইয়া বলিলেন; "দাদা, সব মঙ্গল ত?" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাটীর সর্ব্বস্থান দেখাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপান্তি সমস্ত পরিদর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন; "হ্যাঁ রে, এত বড় অট্টালিকে করবি তা ত তুই বলিস্‌নি। মোরা গেরস্ত মানুষ, পাকা ঘর করবি, এই জানি। এ যে আজার মত অট্টালিকা কোরে ফেল্‌লি? তা যাগ্‌গে, না হয় তাই হল; কিন্তু তুই গাঁয়ের লোকের কি কর্‌লি? মোরা ত মহা গরীব ছিলাম; নারাণ দয়া কোরে যদি এতটা ইশ্বয্যি দিল, আর মোরা সেই ট্যাকায় সংসারধম্ম করব বোল্লে; তা নিজে নিজে অট্টালিকে কোরে শোরিপেটে খেলে কি সংসারধম্ম হয়? মহাপাতক হয়! গাঁয়ের লোকরা

বুঝি কেউ নয়? ভগবান ইশ্বয্যি দেন মানুষের দুঃখু ঘুচুবার তরে। যে ট্যাকায় ঈশ্বর মোদের দুঃখু ঘুচুলে, তাতে তুই আর কার অন্নকষ্ট ঘুচিয়েচিস্, তুই তাই মোরে বল দেখি?”

শম্ভু সে কথায় মনোযোগ না করিয়া বাটীর সমস্ত স্থান তাঁহাকে পরিদর্শন করাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত দেখিয়া বলিলেন; “তা বেশ ত করিচিস্, খুব পেল্লায় কাণ্ড করিচিস্; কিন্তু কৈ, ঠাকুর ঘর কৈ?”

শম্ভু একটু অপ্রতিভ হইয়া অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন; “দাদা, ঐটে ভুল হয়ে গিয়েছে। তা অনেক ত জায়গা আছে, এক জাগায় করলিই হবা। তুমি বলনা কোথায় করবা?”

কৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন; “সে কি রে, ভুল হয়েছে কি রে? হিঁদুর ছেলে, ঠাকুর ঘর কর্‌লিনে। এ বাড়ীতি মুই বাস করবা কেমন কোরি? মুই ত এখানে জলগ্‌গেরণ করতি পারবা না। তুই একেবারে আজার মত বাড়ী কর্‌লি; ঠাকুর ঘর করলি নে; দেশের লোকের কিছু করলি নে, মুই এখানে জলগ্‌গেরণ করতি পারবা না।”

শম্ভুভায়া ভয়ে জড়সড় হইয়া কহিলেন; "দাদা, মুই এখুনি ঠাকুর ঘরের যোগাড় কোরে ফেলছি। তুমি ভেবো না, ব্যাস্ত হয়ো না; হাত পা ধুয়ে জল খাও, জিরোও।"

কৃষ্ণচন্দ্র বিমর্ষ ভাবে উত্তর কবিলেন; "না রে তাও কি হয়? ঠাকুরপিত্তিষ্টে না হোলে বাড়ী ঘর শুদ্ধই হয় না। যে বাড়ীতে শালগেরাম ঠাকুর আর গাইগরু লেই, সে বাড়ী হিঁদুর বাড়ীই লয়! যদি নারাণের কিরপায় দারিদ্দির ঘুচ্‌ল, বাড়ী ঘর হল, তা যার লিয়ে সব হোল, তাকে ছেড়ে তুই সংসারধম্ম করবি কেমন কোরে, তুই তাই মোরে বল দেখি? তুই কেমন কোরি সংসারধম্ম করবি? ঠাকুরঘর লেই, ধম্মকম্ম লেই, হিঁদুর ছেলে হোয়ে নেমখারামী কোরি এখানে থাক্‌বি? মুই ত পারব নি?" এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণপান্তি ফিরিয়া বাটী হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন।

শম্ভুভায়ার হৃৎকম্প উপস্থিত। তিনি বলিলেন; "তবে কি হবা দাদা, তুমি কোথায় থাক্‌বা?"

কৃষ্ণ; "তুই যা বলি কর, বামুন ঠাকুরদের

খবর দে, ঠাকুর পিতিষ্টের ঠিক কর। মুই সেখানে হয় থাক্‌বা। মোর তরে ভাবিস নে। মুই যেখানে হয় এক জাগায় থাক্‌বা।” তারপর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ; “তুই এক কাজ কোরগা ; এখুনি গোলকঠাকুরদের এক মাসের মত খুব একটা বড় সিদে পাঠিয়ে দিগে। দশটা বাঁকে যত ধরে, ভরপূর দিবি, বুঝলি ?”

শম্ভু ; “আজ্ঞে হঁা।”

কৃষ্ণ ; “একটা খুব বড় মাছের যোগাড় করিস্।” এই বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত একজন প্রতি-বেশী ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ পান্তিকে দেখিয়াই বলিলেন ; “কি পান্তি দাদা যে, কবে এসেচ ?” এই কথা বলিয়া দাওয়ার উপর একখানি ছিন্ন কম্বল পাতিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন।

কৃষ্ণ, “এই মাত্র এলাম” বলিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক কম্বলের উপর না বসিয়া দাওয়ার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আবার কহিলেন ; “দেখ দাদাঠাকুর, শেন্তোটা একেবারে আজার মত বাড়ী করল, ঠাকুর ঘর করল না। মুই সে

বাড়ীতে জলগ্‌গেরণ করবা কেমন কোরি ; মুই এইখানেই থাক্‌বা, আর তোমার দুটা পেসাদ পাবা।”

ব্রাহ্মণ ; “তা বেশ বেশ, এ ত আমার সৌভাগ্য”, এই বলিয়া হুঁকা হইতে কলিকা লইয়া গুল ঝাড়িয়া চকমকি ঠুকিতে বসিলেন।

“আরে বাপ্‌রে! মিন্‌সে করে কিরে? দাদাঠাকুর মুই থাকৃতে ওকি কর?” এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে কলিকা জোর করিয়া লইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তামাক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ আর বিশেষ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, “এদ্দিন না তাদ্দিন, কবে না তোমার বাড়ী এসে মুই নিজে হাতে তামুক সেজি খেয়েছি। আর আজ কি না তুমি মোরে দেবা তামুক সাজি?” তামাক প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকা পরাইয়া তাঁহার হস্তে দিয়া আবার ভূমির উপর উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ কম্বলে বসিতে অনুরোধ করিলে পাত্তি

কম্বলখানি গুটাইয়া বলিলেন; "মুই এই মেজেতিই বসি। মুই যা ছেরকালটা করে এসেছি তাই করবা। মুই এখানে বসি; তুমি ওর ওপর বস। হ্যাঁ, এখন দুটো কথা কই এস।" ব্রাহ্মণ দেখিলেন কৃষ্ণ যেমন ছিল তেমনি আছে। ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া স্বয়ং কম্বলের উপর উপবেশন করিলেন।

পান্তি—আচ্ছা, তোমার ভদ্দেরাসনটা কতটুকু জমি?

ব্রাহ্মণ—কাঠা ছয় সাত হবে আর কি?

পান্তি—আচ্ছা ওপাশের জমি থেকে কিছু পাওয়া যায় না?

ব্রাহ্মণ—তা চেষ্টা করলি পেতি পারি। কিন্তু টাকা কোথা?

পান্তি—সে জন্যি ভেবনা, সে যা হয় মুই যোগার করব। মোদের দশ বারো নক্ষী ইট পোড়ান হচ্ছে। তাই থেকে তোমাকে ইট দিতি বলব। তুমি ঐ পাশের ল্যমিডা যোগাড় কোরে দর ঠিক কোরে মোরে একটু নিখে পাঠাবা। আর যদি এই কদিনের মধ্যি ঠিক হয় ত ভালই, তা

হোলে আর লেখালিখি কর্‌তি হবা না।

" ব্রাহ্মণ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে পান্তির প্রতি তাকাইয়া বলিলেন; "তবে ভাই, তুমিই জমিটার যোগাড় কোরে দেও। ও যে রকম লোকের জমি, সে, আমি কিন্‌ব শুন্‌লে, বেজায় কামড় কোরে বস্‌বে। মিথ্যা তোমার কতকগুলো বেশী টাকা বেরিয়ে যাবে।"

কৃষ্ণচন্দ্র গোলক ঠাকুরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ধূমপান করিতে করিতে বাক্যালাপ করিতেছেন, এমন সময় দশজন লোক বাঁকে করিয়া নানাবিধ দ্রব্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা দ্রব্যভার ভূমিতে নামাইয়া দাঁড়াইলে পান্তি তাহাদের এক জনকে বলিলেন; "ওরে একটা ডাবা হুঁকো কিনে নিয়ে আয় ত।" সে তখনি ডাবা হুঁকো আনয়ন করিতে গেল। ব্রাহ্মণ গৃহিণী ও পুত্রকন্যাগণ সানন্দে সমস্ত দ্রব্যগুলি একে একে গৃহজাত করিলেন। ব্রাহ্মণের বৃদ্ধা জননী মালাজপ করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া পান্তিকে শতমুখে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নত হইয়া দ্রব্যগুলি নিরীক্ষণ করিলেন। পরে নিকটে

আসিয়া দুর্গানামের ঝুলিটী পান্তির মস্তকের উপর ঝুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা দুর্গা তোমায় চিরজীবী করুন, কেষ্ট!" অমনি কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ আবার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

হুঁকার সহিত শম্ভু একপ্রস্থ বালিশ মাদুর বিছানাও পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণপান্তি জানিতেন ব্রাহ্মণের শয্যা সম্বল কেবল মাত্র ঐ এক কম্বল। সুতরাং ব্রাহ্মণ যখন বিছানাগুলি সযত্নে রাখিয়া দিতে উঠিলেন, অমনি কৃষ্ণ উক্ত কম্বল খানি অধিকার করিয়া বলিলেন; "দাদাঠাকুর, মোর এই কম্বল, আর তোমার ওগুলি; বাড়ীর ভিতর লিয়ে যাও।" অতঃপর অন্য একজন প্রতিবেশীর বাটীতে গেলেন। কৃষ্ণপান্তি যে কয়দিন রাণাঘাটে রহিলেন প্রতিদিন এক এক প্রতিবেশীর বাটী যাইয়া প্রত্যেকের অভাব মোচন করিলেন। যাহারা পর্ণকুটীরে বাস করিত তাহাদের তৎপরিবর্ত্তে কোটাবাড়ী করিবার পরামর্শ দিলেন, এবং সমস্ত ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে লইলেন। অর্থ সাহায্য দ্বারা অনেককে আলস্য ত্যাগ করাইয়া

নানাবিধ কার্য্যে এবং কাহাকেও বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করিলেন।

বাটীর সম্মুখে অনেক জমি ছিল তদুপরি দুই মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং তন্মধ্যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই নারায়ণ ও শিব প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। মহা সমারোহে দেব প্রতিষ্ঠা হইল; বহু দরিদ্র ও অসহায় পরিবারকে ও ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থদান করা হইল। প্রতিষ্ঠার দিবস হইতে কৃষ্ণপান্তি স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

শম্ভু ভৃত্যবর্গকে অন্তরালে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন; "ওরে দেখিস্, বড় কত্তার কাছে হাজির থাকিস্। উনি বড় সকালে ওঠেন, গাড়ু টাড়ু এগিয়ে দিবি, হাতে জল ঢেলে দিবি, দেখিস্ দাদার যেন কোন রকম কষ্ট না হয়।"

সকলেই উত্তর করিল; 'যে আজ্ঞে হুজুর।'

বড় কর্ত্তা প্রত্যুষে স্বয়ং ভৃঙ্গারহস্তে শৌচে যাইতেছেন দেখিয়া শম্ভু একজন ভৃত্যকে ইসারা করিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি কর্ত্তার হাত হইতে ভৃঙ্গার লইবার চেষ্টা করিল। কর্ত্তা; "যা যা তোরা ঐ শেস্তোর পাছ পাছ যা, মোর পাছ

লাগিস্নে," বলিয়া শৌচে যাইলেন, পরে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে হস্ত মুখ ধৌত করিলেন। তদবধি আর কেহ সাহস করিয়া তাঁহার খানসামাগিরি করিতে যাইত না।

গোলকঠাকুরের ভদ্রাসন বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল এবং তৎসঙ্গেই আরও অনেকের পাকা বাড়ী উঠিল। দুই তিন মাসের মধ্যে হতশ্রী গ্রাম লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্ন হইল। সর্ব্বত্রই মহা আনন্দ দেখা দিল, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই কৃষ্ণপান্তির অদ্ভুত স্বজাতিপ্রিয়তার কথা। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ ভাই, এত দিন দেশে কি একটাও পয়মন্ত লোক ছিল না? লোক পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য যা হোগ একটা কাজ খুঁজে পেত না। আর এখন দেখ একটা পয়মন্ত লোকের দৌলতে গাঁশুদ্ধ লোক লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠেছে। পান্তি-দের কাজের হাঁপায় গাঁয়ের একটীও মানুষ বেকার বোসে নেই।"

রাণাঘাটের দুই ক্রোশ দক্ষিণে বৈদ্যপুর। তন্নি-বাসী লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে কৃষ্ণচন্দ্রের জননী

দেবতাসম ভক্তি করেন এবং পিতৃসম ভালবাসেন। কারণ সহস্ররাম অপেক্ষা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বয়সে ছোট হইলেও তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সহস্ররামও তাঁহাকে পিতৃসম্বোধন করিতেন।

এক সময় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কাহারও পীড়ার জন্য শ্যামা পূজার মানসিক ছিল। তখনও তাঁহাদের প্রতি কমলার কৃপাকটাক্ষ ঘটে নাই। ভ্রাতৃদ্বয় কিছু সামান্য অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্যামা পূজার সমস্ত আয়োজন এবং মূর্ত্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন; পূজার পূর্ব্ব দিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চূর্ণির তীরে পাল্তিদের কুটীরের সম্মুখ দিয়া গমন কালে শ্যামাপ্রতিমাটী তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শ্রাদ্ধের বেদী-মত মৃত্তিকার একটী বেদীর উপর প্রতিমা স্থাপিত, উপরে হোগলার আচ্ছাদন। ব্রাহ্মণ প্রতিমার রূপে মুগ্ধ হইয়া ভাববিহ্বল হৃদয়ে তাহা অনিমেষনয়নে দেখিতে ও করজোড়ে স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা পাল্তি গৃহিনী তাহা শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া স্তব শেষ হইলে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন; "হাঁ মা, এ মূর্ত্তি কোন্ কুমোর গড়েছে?"

বৃদ্ধা; "আর বাবাঠাকুর, কুমোরকে দেবার পয়সা কোথা পাবা? ও কেষ্ট আর শেম্ভো দু ভায়ে গড়ল, চিত্তির করল, সাজ পরাল, সব করল। কেন বাবাঠাকুর, পিরতিমেডি কেমন হোয়েছে?"

লক্ষ্মীনারায়ণ, "এমন প্রতিমে আমি জীবনে দেখিনি, মা। আমি যে কি অপূর্ব্ব রূপ এই প্রতিমেতে দেখলাম তা আর কি বলব। আর কেষ্টতে শম্ভুতে যদি এই মূর্ত্তি গড়ে থাকে, ত মা, নিশ্চয় জানিস্ তোদের প্রতি মায়ের কৃপা হয়েছে; তোদের শীগ্‌গির সব দুঃখ ঘুচে যাবে।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিলে পর বৃদ্ধা গললগ্নকৃতবাসে তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "তাই আশীর্ব্বাদ করো, বাবা, যেন দুঃখুটা ঘোচে।"

ব্রাহ্মণ আবার সস্নেহে কহিলেন, "ঘুচল বোলে, অতি শীগ্‌গির, তুমি দেখো, তোমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য হবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণ ও শম্ভু আসিলে বৃদ্ধা তাঁহাদিগকে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কৃতী হইয়া কি পরিচিত কি অপরিচিত সমস্ত লোকের যখন সহায়তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মাতা একদিন দুর্গাপূজার সময় তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা, তুই এত নোকের উবকার করছিস্, তোর দাদাঠাকুরের অবস্থা ত তেমন লয়, তার কিছু কোরে দে না ?" কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং কি প্রকারে লক্ষ্মীনারায়ণের উপকার করিতে পারেন তাহা জানিবার জন্য একদিন বৈদ্যপুরে গমন করিয়া তাঁহাকে মাতৃপ্রস্তাব জানাইলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের তেজস্বী সন্তান। সদ্‌গুণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য এই বংশ এস্থলে প্রসিদ্ধ। অবস্থা তেমন ভাল না হইলেও শূদ্রের দান পরিগ্রহ তাঁহাদের বংশের কেহ কখনও করেন নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ পান্তির প্রস্তাবে প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া তৎপর কহিলেন; "দেখো কেষ্ট, আমার কোন উপকার কোরতে তোমায় হবে না। তবে তুমি যদি এই

গ্রামের সকলকার উপকার হয়, এমন কোন কাজ কোরতে রাজি হও ত তোমায় একটী কথা বলি ?”

কৃষ্ণ করজোড়ে কহিলেন, “সে কি দাদা-ঠাকুর, তুমি যা আজ্ঞে করবা তাই করবা। তুমি বল মুই কি করবা ?”

ব্রাহ্মণ, “একটী পুষ্কর্ণী প্রতিষ্ঠে কোরে দেও যে তাতে গ্রামের সবাই জল খেয়ে বাঁচবে। এ গাঁয়ে একটাও ভাল পুকুর নেই, দাদা।”

ব্রাহ্মণ দান গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে কৃষ্ণ ভাবিলেন, মাতৃআজ্ঞা পালন করা বুঝি হইল না। ব্রাহ্মণের প্রস্তাব শুনিয়া এখন একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, “তবে দাদাঠাকুর, তোমার নামে ঐ জমীটা কিনে পুকুর পিতিষ্ঠে কোরে দিই ?”

ব্রাহ্মণ, “আমার নামে দিয়ে কি হবে, তোমার নিজের নামে কর।”

কৃষ্ণ কিছুতেই তাহা করিবেন না, লক্ষ্মী-নারায়ণের নামেই করিবেন বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া ব্রাহ্মণ অগত্যা কহিলেন, “তবে

এক কাজ কোরো; পুকুরটী আমার হেঁপা-জতে থাকবে, আমার নামে খাজনা কোরে দেও, সামান্য কিছু খাজনা দেব, তা হোলে আমার মনের খুঁৎখুঁতুনিটা যাবে।” কৃষ্ণচন্দ্র সম্মত হইলেন, পঞ্জিকা দেখিয়া প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করা হইল। কতকটা জমী ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নামে খাজনা করিয়া দেওয়া হইল।*

প্রথামত সর্ব্বাগ্রে পাস্তিকর্ত্তা কর্ত্তৃক স্বহস্তে দুই কুদ্দাল মৃত্তিকা কর্ত্তিত হইলে তৎপর পুষ্করিণী খনন আরম্ভ হইবে। নির্দ্ধারিত দিবসে কৃষ্ণপান্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে পুকুরের কালি করা হয় নাই। তাঁহার লোকেরা বহু অঙ্কপাত করিয়াও কালি স্থির করিতে সমর্থ হইতেছে না। ক্রমে তথায় জনতা হইল। একজন ব্রাহ্মণ যুবক ঘটী হস্তে শৌচে গমনকালে জনতা দেখিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপার নিরীক্ষণে বুঝিল, যে উক্ত অঙ্কটীর কেহই

* লক্ষ্মী নারায়ণের পৌত্র শ্রীযুক্ত বরদা চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখন নানা কারণে শান্তিপুর নিবাসী হইয়াছেন। তাঁহারই নিকট এই তথ্য সংগৃহীত। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অদ্যাপি বেজপুরে বাস করেন।

সমাধান করিতে সমর্থ নহে। সে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া কাগজ কলম লইয়া অতি সত্বর প্রশ্নটীর সমাধান করিয়া দিয়া দ্রুত শৌচে গেল।

ব্রাহ্মণ যুবক প্রত্যাগমন করিলে পান্তি তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "বাবা তোমার নাম কি?"

যুবা; "আমার নাম শ্রীরামচাঁদ দেবশর্ম্মণ, পদবী বন্দোপাধ্যায়।"

কৃষ্ণপান্তি; "তুমি কার পুত্তুর?"

রামচাঁদ; "আমি ৺আন্দিরাম ঠাকুরের পুত্র"।

কৃষ্ণপান্তি, "বটে বটে, তাই ত বলি, দাদাঠাকুরের মুখের আদল তোমার মুখে দেখলাম। তা বাবা, একদিন মোদের ওখানে কির্পা কোরে পায়ের ধূলো দিও না?"

রামচাঁদ; "তা বেশ, বল কবে যাব?"

পান্তি; "কাল সুবিধে হবে?"

রামচাঁদ, "তা হবে।"

কালি মত জমী মাপ করা হইলে কৃষ্ণ প্রথানুসারে দুই কুদ্দাল মৃত্তিকা কাটিয়া গৃহে প্রত্যাগমন

করিলেন; জনতাও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল।

বৈদ্যপুর একটী ক্ষুদ্রগ্রাম। তাহাতে একটী মাত্র মুদীর দোকান। রামচাঁদ প্রতিদিন বৈকালে সেই দোকানের খাতা লিখিয়া থাকে। এরূপ ক্ষুদ্রগ্রামে এমত ঘটনা সংঘটিত হইলে গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সে সংবাদ পৌঁছিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। বৈকালে দোকানে খাতা লিখিতে গিয়া রামচাঁদ দেখিল যে অন্যদিন অপেক্ষা সেদিন একটু বড় গোছের মজলিস্ বসিয়াছে।

রামচাঁদ দোকানে পদার্পণ করিবামাত্র মুদী বলিয়া উঠিল; "এই যে বাঁড়ুয্যে মশাই আসচে; অনেক দিন বাঁচবে। দাদাঠাকুর, এই মাত্তর তোমার কথা হচ্ছিল।"

একজন প্রতিবেশী অন্য একজন প্রতিবেশীকে কহিল, "বাঁড়ুয্যেকে এখন পায় কে? ওর এখন দিন কপাল ফিরে গেল।" তৎপর রামচাঁদকে কহিল, "একটা ভাল দিন দেখে পাত্তিবাড়ী যেও।"

রামচাঁদ, "আজ তোমাদের ব্যাপার নাখ

কি? তাস নেই, পাশা নেই, দাবা নেই, কেবল রোসে গোপ্পি মারছ?”

জনৈক ব্রাহ্মণ, “আরে দাদা, তুমি তোমার সৌভাগ্য বিচার আজ আমাদের তাস পাশা দাবার স্থান অধিকার কোরেছে।”

রাম, “সে কি রকম? আমি গরীব মানুষ, আমার আবার সৌভাগ্য কি তোমাদের চেয়ে বেশী?”

প্রতিবেশী, “আরে বাপ্‌রে! তা আবার নয় কি? আজ তুমি আঁক কসে পান্তি কত্তারে যে কিনে নিয়েছ; তোমার পান্তিবাড়ী যাবার হুকুম হয়ে গিয়েছে।”

অন্য একজন প্রতিবেশী, “আরে ভাই, শুধু কি তাই? পান্তি কত্তার সঙ্গে বাঁড়ুয্যে-জেটার খুব দহরম মহরম ছেল। পালচৌধুরী মশাই পুরোণ কথা ভোলেন না, নিজেই সে কথা বলে গেছেন।”

প্রথম প্রতিবেশী রামচাঁদের প্রতি “পাল-চৌধুরী তোমায় একটা কারবার টারবার কোরে

দেবেন বোলেও আমার খুব মনে নিচ্চে; তা-পর—।”

রামচাঁদ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল; “আরে বাপরে, তোমরা দেখচি আকাশ নিংড়ে জল বার কর। কোথায় কি তার সাকিম নেই। আমিই বা চৌধুরী মহাশয়ের কি করলুম তার ঠিক নেই, একটা আঁক কোসে দিয়েছি, এতে আর হয়েছে কি?”

দ্বিতীয় প্রতিবেশী, “সে কি হে? গাঁয়ের লোক, দেশের লোক, বিদেশের লোক, যে কেষ্ট পান্তির নজরে পড়েছে, তারই কপাল ফিরে গেছে। টাকা দিয়ে কারবার কোরে দিয়ে কত শত লক্ষপতি ছিষ্টি কোরেছে বল দেখি? আর তুমি হলে তাঁর বন্ধুর ছেলে, তোমায় কিছু না কিছু কোরে দেবেই দেবে; আমি যা বলচি তা পরে মিলিয়ে নিও ভায়া।”

প্রথম প্রতিবেশী; “বলাই-খুড়ো ঠিক বলেচে, বাঁড়ুযো, কেষ্টপান্তি যে উপযাচক হয়ে লোকের সহায়তা করে, এ কথা কি তুমি জান না।”

রামচাঁদ; "সব জানি ভাই, আবার নিজের বামনে কপালটাও মানি। তাই ভাই তোমাদের কথায় বড় বিশ্বাস হয় না। যদি তেমনি কপাল হবে, তবে এতদিন কিছু কোরে দেয় নি কেন?"

প্রতিবেশী; "সেটা কেষ্ট পান্তির দোষ নয়, তোমার। সে অন্য গাঁয়ের লোক; তোমার উচিত ছিল একবার তার সঙ্গে দেখা করা। তুমি মট্‌মটে লোক, সেটা কোত্তে পার নি; কাজেই কিছু হয় নি। আর এক কথা, সবই সময় সাপেক্ষ; এখন হয় ত সময় হয়েছে তাই যোগাযোগ হয়েছে।"

এবার রামচাঁদ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে মশাই, তোমাদের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কেবল বাজে কথা, আর মিথ্যে গুজব রচনা; কোথায় কি তার সাকিম নেই, আগে থাকতেই যত কল্পনা, শেষে সব হোয়ে দাঁড়াবে জলপানা। এখন সব ভিড় ছাড় দেখি; নিজের কাজ বাজাই, নইলে উপস্থিত মনিব অন্ন দেবে না।" এই বলিয়া খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিল।

পরদিন প্রভাতে রামচাঁদ পান্তিভবনে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণপান্তি তাহাকে নিকটে উপবেশন করাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি কাজ কর, বাবা ?"

রামচাঁদ, "ওখানকার দোকানে খাতা লিখি।"

পান্তি "কি পাও ?"

রামচাঁদ "দুটাকা।"

পান্তি "তবে ত বাবা সংসারে টানাটানি হয় ?"

রামচাঁদ, "তা আর কি বল্‌ব ?"

পান্তি, "সে যাগ, বাবা, তুমি মোদের বাড়ী কোন কাজের ভার লিতি রাজী আছ ?"

রামচাঁদ, "সেটা জিজ্ঞেস করা বাহুল্য। উন্নতির আশা কে না করে ?"

পান্তি তাড়াতাড়ি ; "ঠিক কথা বলেছ বাবা, ঠিক কথা বলেছ ; তা তুমি মোদের বাড়ীর দাওয়ান হও। কেমন, একাজ করতি পারবা ?"

রাম ; "তুমি বললেই পারি, কেন পারব না ? তবে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিও।"

পান্তি ; "তা হবে এখুন। মোদের এই

গাঁয়ে এসে বাস কর না, তা হলে কাজের আরও সুবিধে হয়।”

রাম; “সেইটী পারব না। এত দিনের বসতবাড়ী ছাড়া বাড়ীর কারুর মত হবে না। আর আমিও সে প্রস্তাব করতে না-রাজ।”

পান্তি; “আচ্ছা আচ্ছা, তাতে আর কি। মুই ভেবেছিলাম তোমার হয়ত তাতে সুবিধে হতি পারে। তবে যদি যাতায়াতে সময় নষ্ট হয়, কষ্ট হয়, ত এইখানেই একটী বাসা কোরে দিব; তুমি প্রথম দিনকতক কাছে থাকি হাতের কাজডা সড়গড় কোরে লেও। কেমন বাবা তায় কোন আপত্তি হবে না?”

রাম; “আচ্ছা, যেমন বলছ তাই দিন কতক কোরে দেখি।”

রামচাঁদ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া বিচক্ষণ দেওয়ানের ন্যায়ই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কার্য্য এরূপ নিপুণতার সহিত চালাইতে লাগিলেন যে তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা তিনি এমন এক অভিনব

প্রণালীতে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে অদ্যাপিও পাল্তিদের কাগজপত্র রাখা সেই প্রথামতই চলিতেছে।

নবম অধ্যায়।

দাওয়ান রামচন্দ্র বিচক্ষণতার পরিচয় দিলে পর শম্ভু তাঁহার সহিত কথোপকথনে বুঝিলেন যে তিনি জমীদারিরও সুব্যবস্থা করিতে পারেন সুতরাং জমীদারি খরিদ করিতে শম্ভুর বিশেষ উৎসাহ জন্মিল। এইবার শারদীয় পূজার সময় দাদা বাড়ী আসিলে শম্ভু তাঁহাকে জমীদারি খরিদ করিতে পরামর্শ দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কৃষ্ণ বাটী আসিলে, শম্ভু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, যে অগাধ নগত মুদ্রা অপেক্ষা তালুক ক্রয় করা যুক্তিযুক্ত, এবং তাহাতে উপস্বত্ব যথেষ্ট। ব্যবসায় মধ্যে মধ্যে ক্ষতি ভোগ করিতে হয়, জমীদারিতে সেরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। উহাতে

উপস্বত্বটা একরূপ চিরস্থায়ী বলা যাইতে পারে। আর পৌত্রাদির ব্যবসা বুদ্ধি না থাকিলে এরূপ সুদূর প্রসারিত কারবার এককালে শূন্যে মিশিয়া যাইবে। জমীদারিতে সে সব ভয় নাই। এই প্রস্তাবে পান্তিকর্ত্তা সম্মত হইলে, জমীদারি ক্রয় আরম্ভ হইল। ১২০১ সালে (১৭৯৪ খৃঃ অব্দ) মামজোয়ান পরগণা ইজারা লওয়া হইল। পর-বৎসর যশোহর জেলার অন্তর্গত দৈতোর পরগণা; ১২০২ হইতে ১২০৬ সালের মধ্যে সাঁতর এবং হাদ্দা পরগণা ক্রয় করা হইল। লবণের নিলাম-স্থলে কৃষ্ণপান্তির যেরূপ সম্ভ্রম, কালেক্টারীর নিলামেও তদ্রূপ সম্ভ্রম হইল। পান্তি মহাশয় কালেক-টরীর নিলামস্থলে উপস্থিত না হইলে নিলাম স্থগিত থাকে। সুতরাং পুরাতন জমীদারগণ কৃষ্ণপান্তির প্রতি মহা ঈর্ষান্বিত হইলেন। তাঁহারা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া নিলামের সময় মিথ্যা ডাক হাঁকিয়া জমীদারির মূল্য চড়াইয়া দেন। তাহাতেও পান্তি যে জমীদারিটি ডাকেন সেটী ক্রয় করিতে নিরাকৃত হন না। একবার তাঁহারা একত্রে যুক্তি করিয়া কৃষ্ণপান্তি যাহাতে ক্রয় করিতে

না পারেন এইরূপ অভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া ক্রমশঃ মূল্য চড়াইতে লাগিলেন। মূল্য অতিরিক্ত হইয়া উঠিল, পান্তি কোন মতেই পশ্চাৎপদ নহেন। জমীদারেরাও ডাক বাড়াইতে নিরস্ত হইতেছেন না। পান্তি ক্রমশঃ মিথ্যা সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কাষ্ঠাসন ছাড়িয়া উঠিলেন। জমীদারগণ পরস্পরের মধ্যে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এটা এবার জব্দ হয়েছে, পালাচ্চে।" পান্তি উঠিয়া কালেক্টারের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র শ্বেতাঙ্গপুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। পান্তি তাঁহাকে চুপি চুপি কহিলেন "দেখ মোশাই, যে যত ডাকবা তার উপর মোর হাজার ট্যাকা দর রইল, মুই চললাম" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পান্তি প্রস্থান করিলে কালেক্টার একটু চিন্তা করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন, "পালচৌধুরী মশাই চোলে গেলেন, কিন্তু আমার উপর ডাকবার ভার দিয়ে গেলেন। আপনারা যে যত ডাকবেন তার ওপর তাঁর হাজার টাকার ডাক আছে। আমার কিন্তু গত কয়েক নিলামে, আর আজকের

ব্যাপার দেখে মনে হচ্চে, আপনারা কিনবেন না, মিছে দর বাড়াচ্চেন! অতএব নিলামে আমি এই ধার্য্য করলুম যে যিনি আমার আদালতে সম্পূর্ণ মূল্য জমা রাখবেন তিনি ডাকিতে পাবেন, নচেৎ নয়। এখন বলুন চৌধুরী মশায়ের এই দরের উপর আপনারা কে কত ডাকতে চান।”

কালেক্‌টারের কথায় জমীদারপুঙ্গবদিগের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহারা লজ্জায় মস্তক নত করিয়া একে একে পলায়ন করিলেন। জমীদারিটী কৃষ্ণপান্তির নামেই ডাক হইল।

এই ঘটনা সন্দর্শন করিয়া একজন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অবস্থার জমীদার কৃষ্ণপান্তির একজন কর্ম্মচারীকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁহে বাপু, তোমাদের কর্ত্তা মহাশয়ের সালিয়ানা কত টাকা আমদানি, যে এ রকম আলি হুকুম দিয়ে জমীদারি খরিদ করেন?”

কর্ম্মচারী; “আজ্ঞে তা ত ঠিক বলতে পারি না। তবে পূণ্যের দিন জমীদারি কাছারিগুলি আর কারবারি গদিগুলি থেকে হাতীর পিঠে,

গরুর পিঠে, ছালা বোঝাই কোরে টাকার আমদানী হোরে, একটা ঘরে ধানের গাদার মত ঢেলে চাবি দেওয়া থাকে। তিন চার দিন পরে সেই ঘর খুলে দেওয়া হয়, আর বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বৌ, ঝি, সবাই এসে একে একে তাঁদের বারষিক্ প্রাপ্য টাকা গুণ্‌তি কোরে নেন, ধানমাপা কাটা পালি দিয়ে নিজের হাতে মেপে নিয়ে যান্। তার পর বাকি টাকা খাজনা-খানায় তোড়াবন্দি কোরে সিন্দুকযাৎ করা থাকে।”

জমীদার মহাশয় সবিস্ময়ে কর্ম্মচারীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা একটা মোট জমা তো তোমরা খাতায় কর ?”

কর্ম্মচারী মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল ; “সে সব কি আর কারুর হাতে থাকে, সে সব খাতা মেজ কর্ত্তার হাতে থাকে।”

নদীয়া জেলার জমীদার এমন কি রাজারা পর্য্যন্ত ঋণের আবশ্যক হইলে কৃষ্টপান্তির দ্বারস্থ হন। ইতি পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্র কৃষ্ণপান্তির অধমর্ণ হয়েন। ঋণ পরিশোধ কালে

কৃষ্ণপান্তি কুসীদ গ্রহণ না করাতে মহারাজা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করিয়া ছিলেন।

এখন পান্তিদের অসীম বিভব। হস্তী, অশ্ব, লোক, লোস্কর, সিপাহী, বর্কন্দাজ প্রভৃতি অনেক। হস্তীর বাসস্থানের জন্য রাজাদের ন্যায় হস্তিশালা, গোশালা, অশ্বশালা ; এবং সিপাহী লস্করদিগের বাসস্থান প্রভৃতি সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে পান্তি-ভবন রাজপুরী সদৃশ প্রকাণ্ড হইল ; চৌধুরী বা পান্তিবাটীই একটা সম্পূর্ণ গ্রাম হইয়া পড়িল।

একদিন দেশ ভ্রমণে বহির্গত বড়লাট মারকুইস অব হেষ্টিংস ক্রমে রাণাঘাটের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এখন পল্লিগ্রামের মধ্যে এত বড় একটী বিষয় বৈভবের ব্যাপার সন্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনুসন্ধানে জানিলেন, যে তাহা কৃষ্ণপান্তির। নামটী তাঁহার বেশ-পরিচিত ছিল, লাট একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। আজ্ঞা পাইবামাত্র পান্তিকর্ত্তা নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন সমভিব্যাহারে তাঞ্জাম আরোহণে বড় লাটের

শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বড়লাট আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া স্বীয় কেদারার নিকট একটী মোড়াতে তাঁহাকে বসিতে আমন্ত্রণ করিলেন। এবং উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে হাসিতে হাসিতে পান্তির সহিত কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, "আপনি রাজা খেতাবের উপযুক্ত। আমার ইচ্ছে আমি আপনাকে রাজা উপাধি দিই। আপনি কি বলেন?"

কৃষ্ণপান্তি মস্তক নত করিয়া চিন্তা করিলেন, "এরা বিদেশী, এরা মোরে আজা খেতাব দে কি করবা? আজা শিবচন্দ্র যখন চৌধুরী খেতাব দিল, এদের দেওয়া আজা খেতাব ত তার চেয়ে বেশী মানের হবা না। মিছে কেন কতকটা বাজে খরচা।" এবম্বিধ চিন্তার পর কৃষ্ণ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন, "মুই সামান্যি মানুষ, আজা শিবচন্দর মোদের চৌধুরী খেতাব দেচেন, তাই ঢের হয়েচে, আর ওসব কাজ নেই মোশাই।"

লর্ড ময়রা নিরহঙ্কার উত্তর শ্রবণে প্রীত হইয়া বলিলেন, "তা বেশ। আমরা তবে আপনাদের 'পাল-চৌধুরী' বলে মেনে নেব। আর একটা

কথা, আপনার চেয়ে বড় জমীদার এ অঞ্চলে আর নেই, আমরা তাই বলি আপনি আপনার ফটকে নহবৎখানা বসান; আর আসা সোঁটা ব্যবহার করুন। এতে বোধ হয় আপনার কোন আপত্তি হবেনা।"

পান্তি, "আচ্ছা তাতে আর আপত্তি কি হবে"; সহাস্ত বদনে এই উত্তর করিয়া লাট সমীপে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনী আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার উন্নতির সময় তাঁহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িলে, তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তৃত বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কোন একটী কর্ম্ম অবলম্বনে নিজ অবস্থার সংশোধন করিতে পারিবেন। এই ভাবিয়া তিনি একদিন প্রাতঃকালে হাটখোলার গদিতে আসিয়া কৃষ্ণ-চন্দ্রকে মনোভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন; "আপনি আমাকে যা হয় একটা কাজ কর্ম্ম দিন।"

কৃষ্ণচন্দ্রের লোক চিনিবার অসীম ক্ষমতা, বিশেষতঃ বানিজ্য-ক্ষেত্রে কে কেমন কাজের

লোক তাহা অতি অল্পেই বুঝিতে পারেন। তিনি আত্মীয়ের প্রস্তাব শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই ত পাল মোশাই তুমি কি কাজ করতি পারবা?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, "কেন মশাই, আপনি যা কাজ দেবেন কোরব।"

কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন; "তা বেশ, তবে ওপারে শালকেতে কখান কিস্তি আসল। তার মালডা কুৎ করি এস ত।" মাল কুৎ করার অর্থ এই যে প্রত্যেক কিস্তিতে কত পরিমাণ মাল ও সেই মালে কি পরিমাণ খাদ অর্থাৎ বাজে মাল মিশ্রিত আছে; এবং সেই সমস্ত মালের মোট ওজন ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা। কাজটীতে একটু বহুদর্শিতার আবশ্যক; অন্ততঃ মালের কতটাকা নমুনা হস্তে লইয়া তাহা বাছাই করিয়া জানিবার চেষ্টা করিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এ কার্য্য নূতন আরম্ভ করিতে হইলে এই প্রকারই করিতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বেশ জানিতেন যে নূতন লোকের পক্ষে কাজটী কঠিন, এবং কিস্তির মাল সম্বন্ধে নূতন লোকের অনুমান

নিশ্চয় ঠিক হইবে না। তবে এই দুরূহ কার্য্যে তাঁহাকে পাঠাইবার কারণ, তাঁহার কার্য্যপটুতা দেখিবার জন্য নহে। তাঁহার মধ্যে কার্য্যতৎপরতা আছে কি না, জানিবার জন্য। কারণ, আত্মীয়টী প্রথমতঃ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, কখনও কোন কর্ম্ম করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, এক সময় তাঁহারা বেশ ধনী ছিলেন; অর্থোপার্জ্জনের জন্য কখনও কোন প্রকার চাকরিক্ষেত্রে তাঁহাকে নামিতে হয় নাই। অতএব তিনি বর্ত্তমান অভাবে পড়িয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা, যাহা ধনীগণের জীবনপথের সহযাত্রী, পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন জীবনক্ষেত্রে কর্ম্মী হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, জানিবার জন্যই তাঁহাকে ঐ কর্ম্মের আদেশ দিয়াছিলেন।

পালমহাশয় কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ একজন পরিচারককে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, "ওরে চট্ কোরে একটু তেল আর তামাক দে, গঙ্গায় একটা ডুব দে লেই।" ভৃত্য তৈল ও তামাক আনিয়া দিলে, তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তৈলমর্দ্দন ধূমপান এবং স্নানান্তে ভৃত্যকে

আবার কহিলেন, "ওরে দেখ শীগ্‌গির একটু কিছু জলখাবার এনে দে ত।"

ভৃত্য কিছু মিষ্টান্ন ও জল আনিয়া দিলে কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে একটু ধমকাইয়া কহিলেন, "দেখ, মানুষকে জল খাবার দিলি তার সাতি তামুকটাও দিতি হয়। পালমোশাইকে তামুক দে।" ভৃত্য তাহাই করিল। ক্ষিপ্রহস্তে স্নান করিয়া জলযোগ করিয়া তামাক খাইয়া ওপারে যাত্রা করিতে পাল মহাশয়ের প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। এদিকে পালমহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের কথামত তৎক্ষণাৎ ওপারে না যাইয়া ভৃত্যকে তৈল তামাকের হুকুম করিবামাত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অপরিহার্য্য দীর্ঘসূত্রতার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া, তদ্দণ্ডেই এক কর্ম্মচারীকে চক্ষুর ইঙ্গিত দ্বারা কিস্তিকুৎ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। সে ব্যক্তি নয়টার সময় আসিয়া একান্তে কৃষ্ণচন্দ্রকে কিস্তির মাল সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পালমহাশয়কে কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ওপারে যাইতে নিবারণ করিলেন না, এবং তিনি কিস্তিগুলি কুঁৎ করিয়া মন্তব্য জানাইলে তদ্বিষয় তাঁহার অনুমান ঠিক কি ভ্রান্ত,

কি স্নানাদিতে অনর্থক কালক্ষেপ করিয়া কার্য্যের অযথা বিলম্ব ঘটাইয়া কার্য্য পণ্ড করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত কথার বিন্দু বিসর্গও তাঁহাকে বলিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে ঐ সমস্ত বলিলেও তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তনের কোনও সম্ভাবনা নাই, যদি থাকিত, তবে কৃষ্ণ-চন্দ্র তদ্বিষয় পরামর্শ দিবার পূর্ব্বেই হইত, এবং ওপারে গমন কার্য্যের উপর স্নান ও জলযোগ স্বরূপ দেহপূজার প্রাধান্য দিয়া বিলম্ব ঘটাইতে তাঁহার প্রবৃত্তিই জন্মিত না। কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মবীর, তাঁহার নিকট ছার দেহের পূজা ছিল না। তিনি কর্ম্মের পূজা করিতেন। যে কয় দিবস পালমহাশয় হাটখোলায় রহিলেন, প্রতিদিন প্রত্যুষে কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমেই তাঁহাকে তৈল তামাক ও জলযোগের জন্য মিষ্টান্ন দিতে শুনাইয়া শুনাইয়া ভৃত্যদের প্রতি আদেশ করিতেন। দেহপূজকগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ঘৃণা এইরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িত। কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য ও অহরহঃ বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃতায় পালমহাশয় বেশ বুঝিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কোন কর্ম্মের

ভার দিবেন না। কিন্তু সাহস করিয়া স্পষ্ট সে বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। আরও কয়েক দিবস পরে বেচারি গৃহে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে কৃষ্ণচন্দ্র যুগোল কিশোর-কে চুপি চুপি আদেশ করিলেন যে পালমহাশয়-কে যেন প্রতি মাসে কিছু সাহায্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

দশম অধ্যায়।

এতদিন মনমুখ এক করিয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিচরণের ফলে কৃষ্ণপান্তি জনসাধারণের অসীম বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা, ইতর, ভদ্র, সুজন, দুর্জ্জন, সকলেই বিশ্বাস করে, যে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইতে পারে তথাপি কৃষ্ণপান্তির প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম হইতে পারে না; পর্ব্বত টলিলেও টলিতে পারে ত হাট-খোলার বড়কর্ত্তার কথা কখনও টলে নাই, কখন টলিতে পারেও না! এমন কি দস্যুগণও

কৃষ্ণপান্তির উপর এতাদৃশ অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এক সময় একদল দস্যু তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিলে, কৃষ্ণপান্তি তাহাদিগকে তাঁহার নৌকা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহার হাটখোলার গদিতে যাইলে তাহাদিগকে প্রভূত পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, দস্যুরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তদনুরূপ কার্য্যও করিয়াছিল। কলিকাতার মধ্যস্থলে হাটখোলায় দস্যুরা দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণপান্তির গদিতে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপান্তি তাহাদিগকে টাকা দিবার পরিবর্ত্তে রাজপুরুষগণের হস্তে ধরাইয়া দিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন, এ প্রকার সন্দেহও তাহাদের মনে হয় নাই। এই ঘটনায় কৃষ্ণপান্তির উপর জনসাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস অতি বিশদ ভাবে প্রস্ফুটিত, অতএব ইহার বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক।

কৃষ্ণপান্তির এখন আর ক্রমান্বয়ে কলিকাতায় বাস করা অসম্ভব। জমীদারি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে রাণাঘাটে গমন করিতে হয়। একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে সন্ধ্যার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অনুচরবর্গ সমভিব্যহারে স্বীয়

বজরায় আরোহন পূর্ব্বক কৃষ্ণপান্তি রাণাঘাট যাত্রা করিলেন। বর্ষাকাল, অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশে এখনও খণ্ড খণ্ড অনেক মেঘ। দক্ষিণা বায়ু ও জুয়ারের টানে নৌকা তীরবেগে ছুটিতেছে। ক্রমে নগর ও উপনগর অতিক্রম করিয়া, দ্রুমরাজি ও দুর্ব্বাদল শোভিত হরিদ্বর্ণ দুই কুলের মধ্যে দিয়া নৌকা চলিতেছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, অস্তমুখিদিনমনির পীত আলোক মেঘগাত্রে প্রতিফলিত। তাহাতে মেঘগুলি যেন জ্বলন্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত। আবার মেঘ হইতে প্রতিফলিত আভায় সমস্ত প্রকৃতি যেন কনকময়ী। যেন এইমাত্র সুবর্ণবৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহাতে বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাড়ী, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু সুবর্ণ বৃষ্টিতে স্নাত হইয়া স্বর্ণ বর্ণে দৃপ্ত। পরেই শিখাহীন অগ্নির ন্যায় দিনমনির অর্দ্ধদেহমাত্র দেখা যাইতেছে। মূহূর্ত্ত পরেই তিনি একেবারেই অদৃশ্য হইলেন; যেন অন্ধকারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লজ্জায় পৃথিবীপ্রান্তে গিয়া চিতানলে ঝাঁপ দিলেন। অমনি অন্ধকারেরা হিমালয়ের গর্ভ হইতে বহির্গত

হইয়া স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তার করিল। আর তাহাদের অনুচর ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, প্রভৃতি হুড়াহুড়ি করিতে করিতে আসিয়া আকাশের কোণে যেখানে একটু মাত্র সোণার আলোক বর্ত্তমান ছিল সে সমস্ত তাড়াইয়া দিয়া মহানন্দে আপনাদের পৈশাচিক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। তাহাতে প্রকৃতিদেবী যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া ধ্যানমগ্ন সাধুহৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং সেই নিভৃতক্ষেত্রেই তাঁহার মত রূপরসের তরঙ্গ ক্রীড়া আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ-পান্তির হৃদয়েও সেই রূপরসের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইল। বজরার একপ্রান্তে বসিয়া কৃষ্ণপান্তি ধ্যান-মগ্ন।

অদূরে একটী ক্ষীণ রশ্মি সহসা বজরার ছাদের উপরিস্থিত যাত্রীদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। স্থানটী চাঁপদানী। আলোক তীরবেগে অগ্রসর হইতেছে। নিমেষ মধ্যে এক প্রকাণ্ড লম্বা ছিপ আসিয়া বজার গাত্রে লাগিল; বজরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। দীর্ঘ বলিষ্ঠকায় পাঁচ সাত জন মনুষ্য নিষ্কোসিত অসিহস্তে বজরায় লম্ফ প্রদান করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে আজ্ঞা দিল; "সবাইকে বাঁধ্!"

ছাদস্থ কর্ম্মচারীগণ চকিতের মধ্যে দস্যুদিগের লৌহকরে ধৃত হইল। পুনরায় মেঘমন্ত্রে সর্দ্দারের "কোথায় কি আছে এখুনি বলে দে, নইলে—"এই কথার সহিত বিদ্যুদ্বেগে নিষ্কোষিত তরবারি বন্দীদিগের মস্তকোপরি আস্ফালিত হইল।

ইতিমধ্যে বজরার সহকারী মাঝি পশ্চাৎদ্বার দিয়া কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীতস্বরে পাস্তিকে বলিল; "কত্তা মোশাই, কত্তা মোশাই, সব্বনাশ হয়েচে, ডাকাত পড়ল।"

"ভয় কি, ভয় কি, ভয় লেই", দৃঢ়স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে কর্ত্তা তন্মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া দস্যুদিগকে বলিলেন; "ওরে ওরে, তোরা কোন উপদ্দেরব করিস্ নে বাবা, মুই কেষ্টপাস্তি। মোর এখুন বেশী ট্যাকা লেই যে তোদের দিই। মুই আজ বাড়ী যাচ্চি; পাঁচ সাতদিন পর তোরা হাটখোলার গদ্দিতে যাস। তোদের খুসী কোরে দিব।"

কৃষ্ণপাস্তির নাম শ্রবণমাত্র সর্দ্দার তরবারি হস্তে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণপাস্তিকে বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিল; পরে পাস্তির বক্তব্য শেষ

হইলে আদেশ করিল; "ওরে কামরার আলোটা নিয়ে আয়ত।"

আদেশ মাত্র এক ব্যক্তি আলোকটী আনয়ন করিল। সর্দ্দার আলোকের সাহায্যে কৃষ্ণপান্তিকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "হুঁা পান্তিমশাই বটে, অন্ধকারে তোমার রংটী মিশিয়ে গিছল, বড় ঠাওর হচ্ছিল না। পষ্ট বল্‌চি বোলে পান্তি মশাই রাগ কোর না?"

পান্তি হাঃ হাঃ রবে হাস্য করিয়া বলিলেন; "যদি রাগই করি, তোর তায় ভয় কি? মুই ত আর খেলোয়াড় লই।"

বক্রগ্রীবা ও বক্রদৃষ্টির সহিত সর্দ্দার কিঞ্চিৎ উপেক্ষা সূচক হাস্য করিয়া বলিল; "খেলোয়াড় হলেই কি ডরাই, পান্তি মশাই? ডরি কেবল বন্দুককে। আর দুনিয়ায় ডরবার কিছু নেই। এখন ঠিক বল দেখি, কবে তোমার গদিতে হাজির হব?"

পান্তি, "এই সোমবার যাবি। তোরা সবাই যাবি ভাই, একবার তোদের মূর্ত্তিগুলো দেখবা।"

সর্দ্দার, "তা বেশ, তোমার সাধ মেটাব; ধরিয়ে দেবে না ত?"

পাস্তি, "নারাণ! কেষ্টপান্তি নেমখারাম নয় রে?"

সর্দ্দার, "কি জানি বাবা, দিন কাল খারাপ বড়। ওরে জাল গুড়ো।" আদেশ মাত্র সকলে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় ছিপে অবতীর্ণ হইয়া নিষ্কোসিত তরবারি পার্শ্বে রাখিয়া দাঁড় ধরিল। সর্দ্দার সর্ব্বশেষে অবতীর্ণ হইলে ছিপ পুনরায় তীরবেগে ছুটিল; ক্রমে বজরার অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন দস্যুদিগের মধ্যে একজন কহিল; "সর্দার খুড়ো, কেষ্টপান্তি দেখ্চি তোমায় যাদু কোরে ফেললে। যদি লুট্‌বে না, তবে এলে কেন?"

সর্দ্দার, "লুটে কিছু পাওয়া চাই ত? ও যখন বল্লে সঙ্গে বেশী টাকা নাই; তখন নিশ্চয়ই গদিতে গেলে বেশী টাকা দেবে। লুট্‌লে কিন্তু তা হবে না। এস্থলে না লোটাই ভাল না কি? কেষ্টপান্তি আমার দাদা খুড়ো বলে ছাড়িনি। তবে ওলোকটার ওপর কোন অত্যাচার করতে

আমার প্রাণ কেমন করে। পষ্টই বল্‌চি বাবা, এতে তোমরা যাই বল না কেন?”

ভ্রাতুষ্পুত্র, “আবে তা নয় খুড়ো। তুমিই ত বল্‌লে দিন কাল বড় খারাপ। আমার ভয় হয় পাছে শম্ভুটা কুপরামর্শ দেয়।”

সর্দ্দার, “যে যাই পরামর্শ দিগ্‌, কেষ্টপান্তি থুতু ফেলে চাটে না।” জনৈক দাঁড়ধারী “জোরে মার” বলিয়া শুইয়া পড়িয়া জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল। অমনি সকলেই হুঙ্কার দিয়া সেই ভাবে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। ছিপ যেন লম্ফে ঝম্ফে ছুটিল।

অপর একজন দাঁড়ধারী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া অতি কঠোর স্বরে বলিল; “হুঁ, হুঁ, জোরে মার, গায়ের কসকসানি ভেঙ্গে নে!”

সর্দ্দার ব্যতীত সকলেই প্রাণভরা লুটপাট ও কাটাকাটীর প্রত্যাশায় উন্মত্ত হইয়া বজরায় পড়িয়াছিল। রক্তলোলুপ সিংহের গ্রাস হইতে শিকার পলায়ন করিলে তাহার যেরূপ শক্তির অব্যবহারে দৈহিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, দস্যুদিগের কল্পনানুসারে কার্য্য না হওয়াতে শরীরের সঞ্চিত

বল তাহাদের একরূপ অব্যক্ত যন্ত্রণা দিতেছিল। তাহারা ঐ বল দাঁড়ের উপর প্রয়োগ করিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিতে লাগিল।

এদিকে কৃষ্ণপান্তিকে দস্যুরা বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে এই সংবাদ বাটীতে পৌঁছিলেই গ্রামে প্রচারিত হইবে, এবং তাহা হইলেই উহাদিগের হাটখোলায় ধৃত হইবার সম্ভাবনা; এই চিন্তা করিয়া কৃষ্ণপান্তি বজরাস্থিত সকল ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "দেখ বাপু, এ কথা কেউ যেন টের না পায়। টের পেলি মোর কতার খেলাপ হবা, মোর অধর্ম্ম হবা, মুই তা হলি জলে ডুবি মরব। এই গঙ্গার ওপর সবাই সত্যি কর কারুকে বলবা না।" সকলেই সত্যে আবদ্ধ হইল; সুতরাং রাণাঘাটে তখনই সংবাদটী রটিল না।

যে সোমবারে গদিতে দস্যুদের আসিবার কথা সেইদিন প্রভাতে কৃষ্ণপান্তি ও শম্ভু বেলা নয়টার সময় হাটখোলার গদিতে উপস্থিত হইলেন। দস্যুগণ পূর্ব্ব হইতেই তথায় পান্তি কর্ত্তার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। কর্ত্তা তাহাদের দেখিবামাত্র মধ্যম

ভ্রাতাকে অন্তরালে লইয়া বলিলেন, "ওরে শেম্ভো এদের সবাইকে এক এক হাজার টাকা দে।" পরে আরও চুপি চুপি বলিলেন; "এরা ডাকাত, বাড়ী যাবার দিন মোর নৌক ধরেছিল। মুই ম'না কোরতি আর লুটপাট করল না। যা শীগ্‌গির ওদের ট্যাকা দে বিদেয় কর।"

শম্ভু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে যাইয়া গোপনে একজন সরকারকে পুলিসে খবর দিতে আজ্ঞা করিলেন।

সরকার কহিল, "মশাই, কত্তা শুনলে আমার দূর কোরে দেবেন। আমি তাঁর হুকুম ব্যতীত থানায় যেতে পারব না, মশাই।"

শম্ভু একজন দৌবারিককে আহ্বান করিয়া তাহাকেও ঐরূপ আদেশ করিলেন। সেও থানায় যাইতে অসম্মত হইল; বলিল, সে দস্যুদিগের মুখেই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু কর্ত্তার আজ্ঞা ব্যতীত থানায় যাইবে না। অগত্যা শম্ভু ভাবিলেন, "যাই দেখি, দাদাকেই বুঝিয়ে বলি, নইলে মিছে এতটা ট্যাকা বেরিয়ে যাবে।"

এইরূপ চিন্তার পর শম্ভু পুনরায় উপরে

গমন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, "দাদা মোদের উচিত ওদের থানায় দেওয়া। ডাকাত বদমায়েস ওদের আবার কেউ ট্যাকা দেয়? আর তুমি বল কিনা ওদের এক এক হাজার ট্যাকা দে। মুই ওদের ধরিয়ে দিই।"

কৃষ্ণপান্তি শম্ভুর প্রতি ভ্রূকুটিযুক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; "কি বল্লি, ধরিয়ে দিবি? আর ওদের বাপ মা ছেলেপুলে সব না খেয়ে মরবে?"

শম্ভু; "তবে ভাগিয়ে দি, ট্যাকা দে আর কাজ নেই।"

কৃষ্ণপান্তি; "সে কিরে? ওরা যে মোর কথায় বিশ্বাস কোরে ছেড়ে দিয়েছিল। মুই তোর কথায় ট্যাকা না দে কি অধর্ম্ম করব, মিথ্যাবাদী হব?"

শম্ভু, "ওরা ডাকাত খুনে, ওদের কাছে আবার মিথ্যেবাদী কি অধর্ম্মই বা কি? ওরা মানুষ খুন করে, মানুষের কেড়ে নেয়। কোথায় ওদের জেলে দেবা, না ট্যাকা দিতি বলছ? কোম্পানি টের পেলি কি হবা?"

কৃষ্ণপান্তি পুনরায় ভ্রূকুটি পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া উত্তর করিলেন; "টের পেলি ত বোয়ে গেল; সে মোর অদেষ্টে যা আছে হবা, তোরে তার ভাবনা কর্তি হবা না। মানষে পেটের দায়ে কি না করে? আবার খাতি পেলিই কোন উপোদ্দেরোব করে না। কোম্পানির কি? ওরা খিচ্চান, ওরা সব করতি পারে; তার ওপর ওরা আজা। মুই হিঁদুর ছেলে; অন্নপূন্নর ট্যাকায় দু দশজনার স্যাবা করতি পেলিই ধম্ম, আর করবার সুবিধে পেয়ে না করলি অধম্ম, মহাপাতক।"

শম্ভু; "বেশ তা যেন হল ট্যাকা দিলে, তাপর, থানায় খবর পেলি তখুনি কোম্পানি যে মোদের ওপর জুলুম করবে?"

কৃষ্ণপান্তি একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন; "তা করে তোর ওপর করবে না, মোর ওপর করবে? মুই তোর কথায় ডরাই নে, মোর অদেষ্টে যা আছে তাই হবা; তুই যা আর মিছে বকাসনে, যা যুগলকে ডেকে দে, আর ডাকাতদের ডেকে দে।"

শম্ভু অনুচ্চৈঃস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে করিতে নিম্নতল হইতে তাহাদের ডাকিয়া আনিলে, কর্ত্তা দস্যুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "হ্যাঁরে, তোরা ডাকাতি করিস কেন?"

সর্দ্দার; "আর কর্ত্তা মশাই, পেটের জ্বালায় করি; নইলে সাধ কোরে ফাঁসীকাঠে কে ঝুলতে চায়?"

কর্ত্তা; "শোনরে শেন্তো শোন! যুগল, তুমি মোর নাঁমে খরচ নিকে ওদের দু দু হাজার ট্যাকা দেও। যাও শিগ্গির যাও, ওরা অনেকক্ষণ বোসে আছে।" পরে দস্যুদিগকে কহিলেন, "তোরা আর সব কোথা, সব শুদ্ধ তোরা ক জন?"

দস্যুপতি; "আমরা বারজন, এসেছি দশজন।"

পান্তি; "তারা আসে নি কেন?"

দস্যুপতি; "সে কথায় আর কাজ কি, তোমার যা দেবার দেও না।"

জনৈক দস্যু; "কেন বলই না খুড়ো, তার দোষ কি?"

দস্যুপতি; "তারা সব বামনের ছেলে, লজ্জায়

আসেনিও বটে, আবার এসেচেও বটে, ঘাঁটিতে আছে, সবাই এলে কি চলে?”

পান্তি যুগলকে বলিলেন; “তুমি যাও, ওদের সবাইকে দু দু হাজার দেও।” যুগল চলিয়া গেলে পান্তি বলিলেন; “শুনলি শেস্তো, ওদের মধ্যে কায়েত বামনের ছেলেও আছে। খেতে পায় না করে কি?”

শম্ভু দস্যুদিগের প্রতি; “তোমাদের ঘর কোথা?”

দস্যুপতি চক্ষু আরক্ত করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে কঠোর স্বরে বলিল; “তোমার সে খবরে কাজ কি? থানায় লিখিয়ে দেবে? দেখ মেজ কত্তা, আমরা চোক দেখলে মন বুঝে নি। তোমার মতলব খারাপ, অনেকক্ষণ টের পেয়েছি। এখুনি আচড়ে তোমার মনের প্যাঁচ শোজা করতুম, আর সবাইকে বেঁধে রেখে সমস্ত সিন্দুক গুলো পাচার করতুম;” বলিতে বলিতে তাহার দেহ স্ফীত হইয়া উঠিল; সে কৃষ্ণপান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল; “কেবল ঐ লোকটা বড় ধার্ম্মিক বোলে, ওর খাতিরে

কোনে হাঙ্গামা করলুম না।” কিঞ্চিৎ নিশ্বাস গ্রহন করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক, বজ্রগম্ভীর স্বরে দস্যুপতি পুনরায় বলিল; “আমরা খুনে নই, শত্তু খুনে নই! আমরাও তোমার দাদার মত নিরন্ন মানুষের মুখে দুটো অন্ন দিয়ে থাকি, তোমার মত শোর পেটে নিজেরাই খাই নি। তোমায় মানা করচি, কোন পেঁচোয়া চাল চালবার চেষ্টা কোর না। করলেই খবর পাব, আর তোমায় চিরজীবনটার তরে বিছানায় শোয়াব।”

দস্যুপতির রোষ ক্রমে সপ্তমে উঠিয়াছে দেখিয়া, কৃষ্ণপান্তি মধ্যম ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন; “অ শেম্ভো, তোর ওসব কতায় কাজ কি? পুলিস ফুলিস যদি ওরা বস না করতি পারল ত এমন সময় দল বেঁধি কোলকেতার সহরে আসল কি করি?”

দস্যুপতি; “তুমি কত্তা মোশাই, দেখ, একটা চৌকীদার এ অঞ্চলে নেই। সত্যি সত্যি এখানে ডাকাতি হোলে একটা চৌকীদারেরও দেখা মিলবে না।”

পান্তিসহোদরদ্বয় বিস্মিত হইয়া দস্যুদিগের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদের মধ্যে দস্যু-পতিই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার। তাহার মুখাবয়ব সুন্দর, চক্ষুদ্বয় ভাসা ও তীব্র কটাক্ষযুক্ত নাসা ও ললাট উন্নত, অধারষ্ঠ রুচির, সুবঙ্কিম ও দৃঢ়সংলগ্ন। গঠন দেখিলেই মনে হয় ব্যক্তি অতিশয় বলিষ্ঠ অথচ চোয়াড়ে নহে, রং প্রায় গৌরবর্ণ। তাহাদের মধ্যে কেবল দুই একজন ব্যতীত কাহারও আকৃতি সর্ব্বাংশে দস্যুর ন্যায় নহে। কৃষ্ণপান্তি দস্যুদিগের ক্রোধ সন্দর্শন করিয়া ভৎর্সনার স্বরে শম্ভুকে কহিলেন; "আবে আধা মাধব! তোর ওসব খবরে কাজ কি? ওরা মনে করবে তুই বুঝি কোম্পানিকে খবর দিবি। তোর এক তিল বিবেচনা নেই।" পরে দস্যুপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "অ সদ্দারের পো তুই ভাই রাগ করিস্ কেন? ও শেস্তো ছোঁড়ার কথা তুই ধরিস নে।"

কৃষ্ণপান্তির কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে চব্বিশ সহস্র মুদ্রার চব্বিশটা তোড়া আনীত হইল। কৃষ্ণপান্তি দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "লোক দে ট্যাকা নৌকয় তুলিয়ে দিব।"

দস্যুপতি মাথা নাড়িয়া কহিল; "না, লোক চাইনি; তুমি একটা একটা সিন্দুক ঘাড়ে দিলে নিয়ে যাব।" এই বলিয়া সঙ্গীদিগের ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং চারি তোড়া লইল; অবশিষ্ট কুড়ি তোড়া সহচরগণের হস্তে দিয়া সকলে অনায়াসে প্রস্থান করিল।

কৃষ্ণপান্তি কিয়দ্দূর তাহাদের সহিত গমন করিয়া বলিলেন; "দেখ্ ভাই, এই ট্যাকা নিয়ে যা হোগ একটা কারবার কোরগে; আর ডাকাতি করিস্ নি, দাদা। যদি তাতি আরো ট্যাকার আবিশ্যক হয়, ত মোরে একটাবার বললিই মুই সাদ্দিমত দিব। কেমন?" দস্যুপতি মুখে কোন উত্তর না দিয়া সম্মতিজ্ঞাপক শির-সঞ্চালিত করিয়া দ্রুত পদে সদলে প্রস্থান করিল।

প্রাগুক্ত ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে একদিন কোন মহাজনের গদিতে একটা দেনা-পাওনার সময়ে কৃষ্ণপান্তি উপস্থিত ছিলেন। এই দেনা-পাওনার ব্যাপারে পাওনাদারটী যথা সময়ে প্রাপ্য টাকা না পাওয়াতে আদালতে অভিযোগ

করিয়া কৃষ্ণপান্তিকে সাক্ষী মানিলেন। কল্য মোকর্দ্দমা, অত্ত কৃষ্ণপান্তি সোপিনা প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাকুল। তাঁহার বিশ্বাস যে আদালতে সত্যবাদীর মর্য্যাদা থাকে না। সেখানে শপথে বিশ্বাস, সত্যবাদীর কথায় বিশ্বাস নাই। পান্তির কিন্তু শপথে অত্যন্ত ঘৃণা। আদালতে সেই ঘৃণ্য কার্য্য করিতে হয়; সুতরাং আদালতের উপরও তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা। সেই আদালতে তিনি যাইতে বাধ্য, কাজেই পান্তি কিছু চিন্তিত।

পরদিবস আদালতে যাইবার সময় যুগলকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন; "তুমি ফরিয়াদির যত ট্যাকা পাওনা ততট্যাকা সঙ্গে লিয়ে মোর সাথি চল।"

যুগল একটু চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "বেশ।"

পান্তি আদালতে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর সহিত একটা পরামর্শ করিলেন; ফরিয়াদি তাঁহার পরমর্শানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। মোকর্দ্দমার ডাক হইলে ফরিয়াদীর সহিত কৃষ্ণপান্তি বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

বলিলেন; "মোশাই, মোরা মোকদ্দমাটী তুলে লিচি। ফরিয়াদীকে তার পাওনা ট্যাকা মুই দিলাম দিইচি। সে মোকর্দ্দমা তুলে নিচ্ছে।"

বিচারক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন; "যদি তার পাওনাই ঠিক হয়, আপনি কেন টাকা দিচ্ছেন?"

গ্রীবা উন্নত করিয়া কৃষ্ণপান্তি গম্ভীর স্বরে কহিলেন; "ফরিয়াদীর পাওনা ঠিক, কিন্তু মুই সে কথা হলফ লিয়ে বলবো না।" এই কথা বলিয়া বিচারকের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই নাগরা পাদুকা ফট্‌ফট্‌ করিতে করিতে আদালত গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণপান্তির প্রতিজ্ঞা অটল; তাঁহাকে হলফ লওয়ান দুঃসাধ্য বুঝিয়া বিচারক এই মর্ম্মে পরোয়ানা জারি করিলেন যে ভবিষ্যতে কেহ কৃষ্ণপান্তিকে সাক্ষীস্বরূপ মানিতে পারিবে না। সেই অবধি তাঁহার আর আদালত দর্শন করিতে হয় নাই।

যুগল গদিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পান্তি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আচ্ছা কর্ত্তা মশাই,

একটা কথার জন্যে এতটা টাকার লোকসান্ কেন করলেন?

পান্তি গর্ব্বিত শ্রীবাক্যজী স্মরিয়া উত্তর করিলেন; "সে কি যুগল? আদালত মোর কতা পেত্যয় করবা না, মোরে হলফ কর্‌বানা, তবে মোর কথা মানবা। সে অপমানডার চেয়ে ট্যাকাডা যাওয়া ভাল নয়?" যুগল আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

বাবুগিরীর উপর সরল প্রাণের লোক মাত্রেরই ঘৃণা। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন অতিশয় সরল, বাবুগিরী রূপ জটিলতার লেশ মাত্রও তাহাতে নাই। সুতরাং বাবুগিরীর উপর কৃষ্ণচন্দ্রের বিজাতীয় ঘৃণা। কৃষ্ণচন্দ্রের জনকয়েক ধনাঢ্য আত্মীয় কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার হাটখোলার গদিবাড়ীতে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। একদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন, খুঞ্চাপোশাবৃত বড় বড় থালা লইয়া পরিচারকেরা উপরে যাইতেছে, যেন কোন নূতন কুটুম্বালয় হইতে উপঢৌকনাদি আসিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র গদিয়ান যুগলকিশোরকে জিজ্ঞাসা করায়

তিনি জানাইলেন যে ঐ সকল থালায় তাঁহার ধনাঢ্য আত্মীয়গণকে জলখাবার দেওয়া হইতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যুগলকিশোরকে কহিলেন; "দেখ যুগল, মুই এখনি এসিছি, দু পয়সা রোজগার করতি। ও সব বাবুগিরী এখানে চলবা না, ওদেরকে স্পষ্ট করি বল ঘর যাতি।" কৃষ্ণচন্দ্রের এই কঠোর আজ্ঞা যুগলকে চক্ষুলজ্জা সত্ত্বেও প্রতিপালন করিতে হইল। এ প্রকার হুকুমজারি করিয়া ধনাঢ্য আত্মীয়দের বিতাড়িত করায়া কৃষ্ণচন্দ্র তিলার্দ্ধ অনুতপ্ত হইলেন না।

জমীদারির প্রজাবর্গ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রসম, এমন কি নিজ প্রাণ অপেক্ষাও বেশী প্রিয়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আনরপুর পরগণার প্রজাগণের সহিত কোনও প্রকার কার্য্যসংস্রবে আসিয়া তাহাদের উপর কৃষ্ণচন্দ্রের অসীম মায়া মমতা জন্মে; এবং তজ্জন্য ঐ পরগণাটী হস্তগত করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হয়। কৃষ্ণ শুনিলেন উক্ত জমীদারীর সত্ত্বাধিকারী নিতান্ত দায়গ্রস্ত, শীঘ্রই তাঁহার অনেক সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত

পরগণাটী যথাবিধিক্রমে তাঁহার সম্পূর্ণ হস্তগত হইল।

এই স্থানের প্রজাগণ সমস্তই প্রায় মুসলমান। রামচাঁদ জমীদারি দখল লইবার পর দেখিলেন ঐ সমস্ত প্রজাগণের নিকট কর আদায় করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। যে প্রজা পাঁচ বিঘার খাজনা দেয়, সে আরও পঞ্চাশ বিঘা ভোগ করে, এবং জমীদারকে তাহা জানিতে দেয় না। মোটের উপর এই পর্গণা হইতে যে উপস্বত্ত হয়, তাহা রাজস্ব্য এবং ও সরঞ্জমি খরচা দিতেই প্রায় অসঙ্কুলান হয়। রামচাঁদ কাগজপত্র দেখিয়াই ইহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান প্রজাগণকে ডাকাইয়া প্রথমে বুঝাইয়া বলিলেন, যে রাজাকে ফাঁকি দেওয়াটা ভাল নহে। তাহাতে তাহারা বহুপ্রকার শপথ করিয়া কহিল যে জমী সকল পতিত আছে; এবং তৎসমুদায় জমী অনুর্ব্বরা, কোন কৃষক সে জমীর একটুকরাও চাষ করিতে সম্মত নহে। রামচাঁদ আনরপুর পরগণার মুসলমান প্রজাদের হালচাল দেখিয়া এবং অন্যান্য স্থানের অভিজ্ঞতায় বুঝিলেন যে, একটু বিশেষ কঠিন শাসন ব্যতীত ও-

সমস্ত প্রজা নেয্য রাজস্বও দিবে না। রামচাঁদ জমী-জরিপ স্বচক্ষে দেখিতে গেলেন; এবং দেখিয়া প্রজাগণের উপর অতিশয় কুপিত হইলেন। তিনি দেখিলেন প্রকৃত পতিত জমী তিলমাত্রও নাই; যাহা আছে তাহা গোচারণ; অনাবাদী জমী আদৌ নাই। তিনি সদর কাছারিতে প্রত্যাগমন করিয়া জরিপ-জমাবন্দির হুকুম দিলেন; এবং তদনুরূপ কার্য্য যাহাতে সত্বর অনুষ্ঠিত হয় তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। দুষ্ট অধার্ম্মিক প্রজাগণ দেখিল তাহাদের রাজাকে প্রতারণা করা আর চলিবে না। যে যতটুকু জমী ভোগ করিতেছে তাহার কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া খাজানা দাখিল করিতে হইবে। অতএব জরিপ-জমাবন্দি যাহাতে না হয় চতুর প্রজাগণ তাহার পরামর্শ আঁটিল। কৃষ্ণচন্দ্রের অসীম সরল প্রকৃতি ধূর্ত্তগণের অবিদিত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একদিন হাটখোলায় কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে জানাইল যে তাহারা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রজা হওয়াতে তাহাদের বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত; তাহাদিগকে পৈতৃক বসবাস তুলিয়া আনরপুর পরগণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন

করিতে হইবে, নতুবা তাহাদের আর নিস্তার নাই।

শৃগালসম শঠ প্রজাগণের সজল নয়নে এবম্বিধ আবেদন শুনিয়া কোমল হৃদয় কৃষ্ণপান্তি প্রজার দুঃখে অধীর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন বাবা, কি হল? কে কি কোরল, যে তোদের পৈতৃক ভীটা মাটী ছাড়ি যাতি হবা? তোদের কে কি কোরল, তোরা তাই মোরে বল?"

তাহারা কহিল, "হুজুর! চাঁদা ঠাউরের উপ-দ্দেরবে মোরা মারা যাই। তিনি জরিপ-জমাবন্দীর হুকুম জারি করছেন। মোরা সবাই এক আদ বিঘা জমী বেশী রাখি সত্যি কথা। তা হুজুর, তা না রাখলি মোরদের কাচ্চা বাচ্চা খাবা কি? সকল জমীনের যদি খাজনা দেই, ত মোরা গরীব মানুস, মোরা খাবা কি, হুজুর? তাই মোরা হুজুরের কাছ এলাম; মোদের যখন ভীটামাটী ছাড়ি যাতি হবা, ত একটাবার হুজুরে হাজির দে যাই। মোরা পেরজা, রাজারে জানিয়ে যাই। তাই হুজুরে জানাতি এলাম। এখন হুজুর হুকুম দিলিই মোরা যাই।"

কৃষ্ণচন্দ্র রামচাঁদকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে চাঁদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার

বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের এই অভিযোগ শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "অ্যা! চাঁদা ত দেখছি ভারী অত্যাচার সুরু করল। তা মুই বলছি তোদের কোথাউ যাতি হবা না। মোর বংশে একডা ছেলে পিলে থাকতি, কেউ অনরপুরির পেরজার উপর জরিপ-জমাবন্দি করতি পারবা না—মোর এই হুকুম। তোরা যা নিচ্চিন্দি থাক্‌গা।"

প্রজাগণ আনন্দে পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া রহিল। তাহারা কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া, পাস্তি মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "কি, তোরা চাস্‌ কি, পষ্ট কোরি বল না।"

প্রজাগণের মুখপত্র করজোড়ে অতি বিনীত ভাবে কহিল, "হুজুরের হুকুমডা যদি একটু চিকুটে নিখে দেও, ত মোরা লিচ্চিন্দি হই ঘরকে যাই।"

কৃষ্ণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ যুগলকিশোরকে ঐ মন্তব্যে একখানি পরোয়ানা-পত্র লিখিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

প্রবঞ্চক প্রজারা এই পত্র হস্তগত করিয়া পরামর্শ করিল, যে চিরকালের মত জরিপ-জমাবন্দি হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়, দাওয়ান

রামচাঁদকেও উৎকোচ দ্বারা হস্তগত করা। এই যুক্তি করিয়া তাহারা বহু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক একদিন সন্ধ্যা-কালে দাওয়ান রামচাঁদের বাড়ী উপস্থিত হইয়া, তাহার সম্মুখে সমস্ত টাকা "হুজুরের নজরানা" বলিয়া ঢালিয়া দিয়া আপনাদের অভিপ্রায় জানাইল, এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পত্রের একখানি নকল দেখাইল।

রামচাঁদ আপন বৈটকখানায় বসিয়া শট্‌কায় তামাক খাইতেছিলেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া রামচাঁদ দেখিলেন যে ধূর্ত্ত প্রজাগণ তাঁহার উত্তম ব্যর্থ করিয়াছে, এবং তাঁহাকেও তাহাদের অসৎপথের সহযাত্রী করিবার জন্য রাশিকৃত মুদ্রা সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছে। তিনি এক মুহূর্ত্ত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "তোদের অসাধ্যি কাজ নেই। চিটিখানা ত দেখচি মিথ্যে। আসল কথা এই টাকাটা আমায় ঘুষ্ দিচ্ছিস্, যাতে এই চিটিখান আমি মঞ্জুর কোরে নেই।"

তাহাদের মুখপত্র কহিল, "না দাওয়ানজি মুশাই, আসল চিটি মোদের কাছে আছে, এডা তার নকল।"

দাওয়ানজি কহিলেন, "ওটা মিথ্যে কথা, চিটি-ফিটি নেই। তা তোদের কি একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই? মুসলমান হোয়ে এতটা নেমখারামি তোরা করবি?

প্রজা হোয়ে রাজাকে এমন কোরে একেবারে ফাঁকি দিবি? এ সব বড়ই অধর্ম্ম, আমি এ জুয়াচুরি মানব না, তোরা যা;” বলিয়া পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রজারা তখন ব্যস্ত হইয়া কহিল, “দাওয়ানজি মুশাই, মোরা পাকা কাম করিছি, বড় হুজুরের সৈ-মোহরের চিটি লিয়েছি, এই দেখ মোদের ঠাঁই আছে।” এই বলিয়া পত্রখানি দূর হইতে তাঁহাকে দেখাইল।

রামচাঁদ কহিলেন, “ও জাল চিটি! কেষ্ট পান্তি এত বোকা নয়। সে আপনার গণ্ডা তোদের চেয়ে ঢের বেশী বোঝে, নইলে এতটা ইশ্বয্যি কি করতে পারে? ওটা একটা জাল চিটি, আদালতে টেঁকবে না।”

প্রজারা, “তবে তুমি না দেখলি বিশ্বাস যাবা না? তা এই দেখ,” বলিয়া আসল পত্রখানি দাওয়ানজি মহাশয়ের নিকট দূর হইতে নিক্ষেপ করিল। দাওয়ানজি মহাশয় ব্রাহ্মণ, তাহার উপর তামাক খাইতেছিলেন, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার প্রকাণ্ড কলিকাসহ আলবোলাটী নষ্ট হইবে,

সুতরাং তাহারা দাওয়ানজির চৌকি হইতে দূরেই ছিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া রামচাঁদ কহিলেন, "তা বেশ, এচিঠি ঠিক বটেত কত টাকা এনেচিস্? আর ওটাকা ত আমায় দিলি ?"

প্রজারা সাগ্রহে কহিল, "আজ্ঞে হ্যা হুজুর। ওডা আছে আট হাজার ট্যাকা। মোরা বছর বছর হুজুরকে ওর অদ্দেক ট্যাকা দিতি রাজি আছি। হুজুর আর কোন হাঙ্গামা কোর না।"

রামচাঁদ তাহাদিগকে সম্মতি জানাইয়া টাকা গণিয়া তোড়াবন্দি করিতে কহিলেন; তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তিনি অমনি পত্রখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া তাঁহার প্রকাণ্ড কলিকার অগ্নির উপর দিলেন, এবং অপর হস্তে একটী কলমের দ্বারা চাপিয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। পরে জলদগম্ভীর স্বরে দুই জন পাইককে ডাকিয়া কহিলেন, "তোড়া গুলো নিয়ে মেজ কত্তাকে দে, এই কজন প্রজার নামে জমা কোরে নিতে বল। আর মেজ কত্তারে আমার নাম কোরে বলবি, যে আনরপুরের জরিপ আরম্ভ করতে আমি পোর্শু সকালে নিজে যাব। কাগজপত্তর কাল সব ঠিক থাকে যেন।"

সেই মুহূর্ত্ত পাইক দুইজন কতক আপনাদের ও কতক প্রজাদের স্কন্ধে টাকার তোড়াগুলি চাপাইয়া শম্ভুর নিকট লইয়া উপস্থিত করিল। প্রজাগণ নির্ব্বিরোধে দাওয়ানজির আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সেই গভীর নিশীথে একখানি দ্রুতগামী নৌকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় পুনর্যাত্রা করিল।

বেলা প্রায় দশটা, কৃষ্ণচন্দ্র বসিয়া তৈল মর্দ্দন করিতেছেন এমন সময় জনকয়েক আনরপুরের প্রজা আসিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, আবার কি হোল, আবার এলি যে ?"

একজন প্রজা কৃতাঞ্জলিপুটে জানু পাতিয়া উত্তর করিল, "হুজুরের পরোয়ানা দাওয়ানজিঠাউর ছিরে ফেলছেন, আর লিজের হুকুম বাহাল রাখছেন।" ঘটনাগুলি তাহারা এতই অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল যে সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করা যায় না।

কৃষ্ণচন্দ্র তাহা শুনিয়া অতিশয় রুষ্ট হইয়া কহিলেন ; "বটে! চাঁদার এত বড় আস্পর্দ্ধা! সে কত ভাত দুধ দে খায়, যে মোর চিঠি ছিঁড়ল ?" বলিয়া সেই তৈলমর্দ্দিতাবস্থায় একখানি ঘোল

দাঁড়ের নৌকায় উঠিয়া রাণাঘাটযাত্রা করিলেন।

বাটী পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রামচাঁদ্র সন্ধ্যা করিতে ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র দাদার হঠাৎ আগমনের কারণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে একাকী যাইতে অতীব ভীত হইয়া দাওয়ানজির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বাটী যাইয়া আপন প্রকোষ্ঠেই বসিতেন; এবং যাহাকে আবশ্যক হইত তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। দাওয়ানজি আহ্নিক শেষ করিয়া শম্ভুর নিকট ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমি ত বোলে ছিলাম, তারা আবার বড় কর্ত্তার কাছে দশখানি কোরে লাগাবে। এখন চল, ভাল সামলান যাগ্।"

দুইজনে বড় কর্ত্তার সম্মুখীন হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র সরোষে আপন ভ্রাতাকে কহিলেন, "হ্যাঁরে শেম্ভো, তুই মোরে চাস্ না চাঁদারে চাস্? তুই কারে চাস্, তাই বল!" শম্ভু ভয়ে কোন উত্তর করিতেছেন না; অবনত মস্তকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বারংবার এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে দাওয়ানজি কহিলেন, "ও কি কথা? শম্ভু তোমাকে চাইবে না ত কি আমাকে চাইবে? ভাই ভাইকে চাইবে না ত কি পরকে চাইবে? তা তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যখন এতটা গোলযোগ দাঁড়াচ্চে তখন আমিই যাচ্ছি। তবে ব্যাপারটা কি হয়েছে বল দেখি?"

কৃষ্ণচন্দ্র এতক্ষণে দাওয়ানজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; "বলি হ্যাঁরে চাঁদা, তুই কত ভাত দুধ দে খার্স যে তুই মোর চিঠি ছিঁড়লি, নিজের হুকুম বাহাল রাখলি?"

রামচাঁদ; "হ্যাঁ ছিঁড়িচি, আর নিজের রায় বজায় রেখেছি; নইলে যে তোমার সব্বনাশ হয়।"

কৃষ্ণচন্দ্র; "তোর ত ঐ এক কথা, মোর সব্বনাশ হয়। কি সব্বনাশ হয়?"

দাওয়ানজি; "হয় না ত কি? তুমি কি জমীদারি খরিদ করেছ ঘর থেকে কোম্পানিকে খাজনা দিতে, না জমীদারিতে কিছু মুনফা যাতে হয় তার তরে?"

কৃষ্ণ অতি ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিস্ কিরে, আনরপুরটাতি কি মুনফা নেই?"

রাম; "কোথায় মুনফা? ঘর থেকে খাজনা দাখিল কোরে আসছ। প্রজাগুলো সব চোর; পাঁচ বিঘের নাম কোরে পঞ্চাশ বিঘে দখল কোরছে; তোমায় লুটে খাচ্চে।"

কৃষ্ণচন্দ্র; "তা বেচারিদের কাছ থেকি কিছু বুঝিয়ে পড়িয়ে গায় হাত বুলিয়ে আদায় করগা; তুই যে একেবারে নম্বা কাণ্ড জরিপজমাবন্দি নাগিয়ে দিলি, তারা কাচ্ছা বাচ্ছা লিয়ে যায় কোথাকে?"

রামচাঁদ; "দেখ, তুমি আর জমীদারি কিনো না, তাহলে তোমার সব যাবে, ঐ রকম জোচ্চোর প্রজার পাল্লায় পোড়ে। তুমি ত জমীদারির কিছুই বোঝ না, কেবল অদেষ্টের জোরে এতটা ইশ্বয্যি কোরেছ বইত না। তোমার আনন্দপুরের আদুরে প্রজারা দুবিঘে চার বিঘে বোলে বিশ বিঘে, পঞ্চাশ বিঘে কোরে একোজন ভোগ করছে। এতে মুনফা চুলোয় যাগ্ সদর খাজনাটাই হয় না। সেই জন্যেই ত সাবেক মালিক প্রজা শাসিত করত্তে পারল না; আর খাজনা-খেলাপের তরে বিষয়টা নিলেম হল।"

কৃষ্ণচন্দ্র, "বলিস্ কি রে, চাঁদা?"

রামচাঁদ, "হ্যাঁ আমি সব খবর নিয়েছি।"

কৃষ্ণচন্দ্র, "তা জরিপ কোরে তুই—"

রামচাঁদ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "তুমি জমীদারির কিছুই বোঝ না। আমি বলি তুমি আর জমীদারি কিনো না। জরিপ করলে তোমাকে ওরা আর ঠকিয়ে খেতে পারবে না। ওদেরও তাতে কোন লোকসান নেই, আর তাতে ওরা তোমার জমীদারি ফেলে কোথাও পালাবে না। ওসব মিছে কথা বোলে তোমায় বোকা বুঝিয়েছে। তুমি ত প্রজাদের চাতুরি কিছুই জান না, দেখোও নি, তা কি বুঝবে। তা সে যা হোগ, তোমরা দুই ভায়ে এখন জমীদারি চালাও। আমি যাবার সময় এতদিন তোমাদের নুন খেয়েছি, একটা সৎপরামর্শ দিয়ে গেলাম। আমি চোলে গেলেই সব ছোঁড়ালেট্যা চুকে যাবে।"

এই বলিয়া রামচাঁদ যেমন ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন অমনি কৃষ্ণচন্দ্র অতীব ব্যগ্রস্বরে "ওরে চাঁদা তুই যাসনে, ওরে চাঁদা তুই মোর মাথা খা যাসনে" বলিতে বলিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে ফিরাইলেন।

রামচাঁদ একটু মৃদু হাসি হাসিয়া মনে মনে কহিলেন, "ভাল পাগলের পাল্লায় পড়েছি;" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আচ্ছা, আমার যাওয়া না যাওয়া পরের কথা, তুমি এখন একটু মাথায় জল দিয়ে কিছু খাও দেখি?"

কৃষ্ণচন্দ্র, "তুই বল যাবি নে, তবে মুই লাইব।"

রামচাঁদ, "তা হবে না, তুমি যদি এখনি মাথায় জল দিয়ে কিছু না খাও, ত আমি এখনি চললাম।"

কৃষ্ণচন্দ্র, "আচ্ছা আচ্ছা, চাঁদা তুই যাস নে, মুই এখুনি একটা ডুব দে আসছি;" এই বলিয়া গামছা স্কন্ধেই ছিল চূর্ণিতে স্নান করিতে চলিলেন। রামচাঁদ ও শম্ভু সঙ্গে চলিলেন।

এতক্ষণে শম্ভু সাহস পাইয়া দাদার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আনরপুরের প্রজাগণের আদ্যোপান্ত ব্যাপার তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া কৃষ্ণ-চন্দ্র আরও আগ্রহসহকারে রামচাঁদকে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "বাবা চাঁদা, তুই বল যাবি

নে ; নইলে মুই তুটো ভাত থির হই গিলতি পারবা না। তুই বল যাব না।” রামচাঁদ তাহাই বলিলেন তবে কৃষ্ণচন্দ্র সুস্থির হইয়া ভোজনে বসিলেন এবং রামচাঁদকে কহিলেন ; “মুই আর তোরে কোন কথা বলবা না ; তুই যা ভাল বুঝিস কর গা।” আহারান্তে কৃষ্ণচন্দ্র সেই রাত্রেই কলিকাতায় পুনর্যাত্রা করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

লবণের ব্যবসায় এখন এরূপ প্রসারিত হইয়াছে যে কৃষ্ণপান্তি সমস্ত লাটগুলি ক্রয় করেন; পরে অন্যান্য মহাজনেরা তাঁহার নিকট হইতে খরিদ করেন। কয়েকদিন যাবৎ লবণের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপান্তি লবণ ক্রয় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন।

মধুসূদন রায় একজন ভদ্রলোক ; বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম করেন না। তাঁহার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি আছে, তাহারই আয়ে অতি কষ্টে তাঁহার সংসার-

যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লবণের দর অত্যন্ত কম শুনিয়া তিনি ভাবিলেন যে এই সুযোগে কতক পরিমাণ লবণ ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে; আর কিছু বেশী টাকা সংগ্রহ করিয়া অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া রাখিলে চিরজীবনের জন্য দুঃখের অবসানও হইতে পারে। ইত্যাকার চিন্তা করিয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজন সমীপে অতি কষ্টে সাত শত মাত্র টাকা সংগ্রহ করিয়া, মধুসূদন কৃষ্ণপান্তির নিকট বহু পরিমাণ লবণের বায়না করিলেন। চুক্তিপত্রে বায়নার টাকা ধার্য্য হইল, সার্দ্ধ সহস্র মুদ্রা। চুক্তির দিন কেবল মাত্র সাত শত মুদ্রা প্রদান করিয়া মধুসূদন পান্তিকর্ত্তাকে বলিলেন; "বাকী টাকা পাঁচ সাত দিনের মধ্যে দিয়ে যাব।" বন্দোবস্ত এইরূপ হইল যে লবণ পান্তির গুদামেই থাকিবে; মধুসূদন তথা হইতেই মাল বিক্রয় করিয়া মূল্য ও গুদাম ভাড়া এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

পান্তি এ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে মধুসূদন পুনরায় বলিলেন; "মশাই, আমায় অনুগ্রহ কোরে

সাতদিন সময় দিতে পারেন না? আমি ঐ সাত দিনের মধ্যে যদি সব টাকা চুকিয়ে না দিই, ত আমার ঐ বায়নাপত্তর নামঞ্জুর হবে, আর ঐ সাত শ টাকা বাজে-অপ্ত হবে।” পান্তি প্রথমে অসম্যত হইলেন, কিন্তু মধুসূদনের ব্যগ্রতা দেখিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন।

হতভাগ্য মধুসূদন কিন্তু বহু চেষ্টায়ও অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। লবণের বাজারও উঠিল না যে কিয়ৎ পরিমাণ মাল বিক্রয় করিয়া বায়নার বাকী টাকা দিয়া ফেলেন। নির্দ্ধারিত দিন অতীত হইল, বক্রী টাকা দেওয়া হইল না। মধুসূদন লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। পান্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন না; এমন কি সাক্ষাৎ ঘটিবার ভয়ে হাটখোলা অঞ্চলেই পদার্পণ করেন না। এদিকে মাস দুই পরেও লবণের বাজার পূর্ব্ববৎ রহিল; সমস্ত বাজারে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ। এমন সময় একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল, পথে দুই তিন খানি লবণের জাহাজ ঝড়ে জলমগ্ন হইয়াছে। সেই দিন হইতেই লবণের দর চড়িতে লাগিল এবং ক্রয়

বিক্রয়ও বহু পরিমাণে হইতে লাগিল। কৃষ্ণপান্তি এতকাল একছটাকও বিক্রয় করিতে পারেন নাই। হাটখোলার সুচতুর বড়কর্ত্তা দর প্রথমে উঠিতেই বাজারে লবণ বাহির করিলেন না। তিনি সংবাদ রাখিতে লাগিলেন, অপরাপর মহাজনদিগের গুদামে আর কত পরিমাণ লবণ আছে। যেমন দেখিলেন যে লবণের গুদামগুলি নিঃশেষপ্রায়, দরও প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, অমনি দুই তিন খানি চুক্তিপত্রে সমস্ত লবণ এককালে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। অপর্য্যাপ্ত লাভ হইল। লাভ ও খরচ হিসাব করিয়া, পাকা খাতায় জমা খরচের সময় বড়কর্ত্তা যুগলকে বলিলেন, "মোশাই মধুসূদন রায়ের বায়না পত্তর মত, তার লবণের সমস্ত মুনফাটী তার নামে আমানৎ রাখ। আর মানুষটীর খোঁজ করো।"

যুগল বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তাঁর কড়ার মত বায়না যে বাজে-আপ্ত হয়েছে? তিনি এক সপ্তার মধ্যে বাকী টাকা দিতে পারেন নি?"

পান্তি একটু মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "বলি মুই কি এদ্দিন এক গুঁড়ো নুন বেচতি পারছলাম? বাজার সময় মত চড়লি সেও, বয়নাপত্তর

মত কাজ করতি পারত। অমন হাঁকাই করতি নেই; সে ছাঁপোষা, তারে মারলি মোর অধম্ম হবা। তোমায় যা বল্লাম তাই কর।" এই বলিয়া উপরে স্বীয় কক্ষে যাইয়া বসিলেন; পরে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, "মানুষটী কারবারী নয়; তাই ট্যাকার যোগার করতি পারল না। বেচারা মনে হয়, মহা সাদা সিদে নোক, মরি বাঁচি করি ট্যাকা দিয়েছে। বাকীটে জোগার করতি পারল না। তাই তখুনি মনে হয়েছিল মানুষটী বাকী ট্যাকা দিতি পারবা না।"

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস অতীত, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মধুসূদনের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। চুক্তি পত্রে যে ঠিকানা লেখা ছিল, সেই ঠিকানায় সন্ধান করিয়া জানা গেল যে কয়েক দিন পুর্ব্বে মধুসূদন সে বাটী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাড়ীখানি তাঁহার নিজের নহে, ভাড়া করা।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণচন্দ্র কোনও কর্ম্মোপলক্ষে গঙ্গাতীরে গিয়াছেন, এমন সময় গাড়ার ভিতর হইতে দেখিতে পাইলেন মধুসূদন

অদূরে একটী জেটীর উপর ভ্রমণ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া, "ও আয় মোশাই, ও আয় মোশাই," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে রায় মহাশয়ের দিকে চলিলেন। লোকটী ডাক শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া কৃষ্ণপান্তিকে দেখিবামাত্র করোজোড়ে নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণপান্তি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "কৈ মোশাই, আপুনি বায়নার বাকী ট্যাকা দিলে না ? একবার দেখাও করলে না ?"

মধুসূদন বেদনাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "মশাই, আমার পোড়া অদেষ্টে নেই, কি করি ? কোন মতেই আর বাকী টাকা সংগ্রহ করতে পারলুম না। এক ছটাক নুণেরও বায়নাপত্তর করতে পারলুম না। আমার সবই মূলে হাবাৎ হোয়ে গেল।"

পান্তি, "সে কেমন ?" মনে মনে ভাবিলেন, "হায় হায়, যা ভেবি ছিলাম তাই ঠিক, এমন নোকের ট্যাকা বাজে-আপ্ত কি মানুষে করে ? হায় ! হায় !"

মধুসূদন, "আজ্ঞে, ঐ সাতশ টাকাই যে কৰ্জ্জ কোরে দিয়েছিলুম। এখুন ঐ সাতশ টাকার দায়ে আমার ভিটেটা পর্য্যন্ত বেচতে হবে, নইলে ঋণমুক্ত হোতে পারব না," এই কথা বলিতে বলিতে মধু-

সূদনের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্রও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

পান্তি সত্বর নেত্র মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "তবে মোর নেকট একটাবার গেলে না কেন? একটাবার দেখা হলি হত?"

মধুসূদন একটু বিস্ময়াপন্ন হইয়া অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন, "মশাই, মানুষের কাছে দুঃখু জানান কেবল নিজেকে হীন করা বইত নয়? যদি মানুষের মরম মানুষ বুঝবে ত অনাহারে এত মানুষ মরবে কেন? আর জগতে এত দুঃখুইবা হবে কেন?"

এইবার পান্তির অশ্রু আর বাধা মানিল না; চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া তিনি বলিলেন, "মোশাই দেড় নক্ষি ট্যাকার নুণ থরিদ করেছিলে। আপনাকার নুণ মুই বেচে দিয়িছি। তাতি আপনকার এক নক্ষি পনর হাজার ট্যাকা মুনফা মোদের থাতায় আমানৎ আছে।" এই বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া "মোদের গদিতি পায়ের ধূলো দিলিই ট্যাকা পাবা" বলিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মধুসূদন ঐ কথা শ্রবণ-মাত্র "একি! একি!" বলিতে বলিতে জেটির উপর পড়িয়া গেলেন। অদূরে জেটির অপর প্রান্তে এক ব্যক্তি পশ্চিম গগণের রাগময়ী লীলাভিনয় দেখিয়া আপনার ভাবে আপনি মোহিত হইতেছিলেন। মধুসূদনের চীৎকার শুনিয়া তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, মধুসূদন ধূলিশয্যায় শায়িত। তৎক্ষণাৎ ভাবমালা জাহ্নবীসলিলে বিসর্জ্জন দিয়া মধুসূদনের নিকট আসিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার অনুমান ঠিক, মানুষটী মূর্চ্ছিত। অবিলম্বে তিনি আপন মস্তকস্থিত উত্তরীয়খানি গঙ্গার জলে সিক্ত ও মধুসূদনের লুণ্ঠিতমস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপিত করিয়া, সিক্তবস্ত্র পীড়ন করিয়া মুখে জল দিয়া, বস্ত্রের অপর প্রান্ত দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মধুসূদনের আকৃতি সুশ্রী; বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বয়স পঁয়ত্রিশের অধিক হইলেও ততোধিক দেখায় না। প্রাচীন আগন্তুকটী মধুসূদনের মস্তক অতি সন্তর্পণে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, মধ্যে মধ্যে সিক্ত উত্তরীয় নিষ্পীড়ন করিয়া মুখে জলসেচন ও তৎসঙ্গে ব্যজন করিতে করিতে দেখিলেন, মূর্চ্ছিত

ব্যক্তির মুখের নীলবর্ণ ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া তাহাতে স্বাভাবিক বর্ণের আবির্ভাব হইতেছে। মধুসূদন ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলন করিলেন ; এখনও সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করেন নাই, মধ্যে মধ্যে চক্ষু উন্মীলিত করিতেছেন আবার পরক্ষণেই যেন অবসন্ন হইয়া মুদ্রিত করিতেছেন। এই অবস্থায় প্রায় এক দণ্ড কাল অতীত হইলে মধুসূদন জ্ঞানলাভ করিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

এদিকে শান্তি-মহাশয় অশ্রুমোচন করিতে করিতে গাড়ীতে বসিলে তাঁহার হৃদয়ে নানাবিধ চিন্তা-প্রভঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইল। চূর্ণিতে স্নান করিতে গিয়া যে ব্রাহ্মণ টাকার পুঁটুলী ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। অনেক সময়েই তাহা মনে পড়ে, কিন্তু আজি তাহা মনে ভিন্ন-ভাবে উদিত। ঐশ্বর্য্য এখন সত্য সত্যই অতুল, তবে আর কেন ? এখনও কি ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন ? জীবনের ত প্রায় শেষদশা আগত ; ঐ সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্যের ব্যবহারই বা কিরূপ করিবেন ? আবার আড়ংঘাটার গোস্বামীজির উপদেশ, ঐশ্বর্য্য ভগবানের,

ধনী মানুষরা তাঁহার ভাণ্ডারী মাত্র; এ কথাও মনে পড়িয়া গেল। ইহারাই বা অর্থ কি? ভাণ্ডারী কি চিরজীবন অর্থসঞ্চয়ই করিবে? না, যাহার হস্তে এই সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য পড়িবে সে কি নিজেকে ভগবানের দাস বা ভাণ্ডারী জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি ও বিলাসিতায় বিরত থাকিয়া দারিদ্র্যনিপীড়িত নররূপি-নারায়ণ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে?

ইত্যাকার কতই প্রশ্ন অস্ফুট ভাবে পাল্লি-হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। নিরক্ষর পাল্লির মন দেখিল না, যে আমাদের অর্থনীতির এই সমস্ত গভীরতম প্রশ্নের সরল মীমাংসা আমাদিগের লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণায় অভিব্যক্ত। মহামায়া লক্ষ্মীরূপে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতেছেন। কিন্তু একটী জাতির মধ্যে একদিকে ধনের হ্রাস না হইলে অপরদিকে ঐশ্বর্য্যের সঞ্চয় অসম্ভব। একস্থানে ভীষণ দারিদ্র্য না জন্মিলে আর একস্থলে ঐশ্বর্য্য কেন্দ্রীভূত কোন্ দেশে হইয়াছে? কোনও জাতির ইতিহাসে তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায় না। জীবনে জটিলতা, আলস্য, বিলাসিতা, হৃদয়হীনতা ও কাপুরুষতা উৎপাদনের একমাত্র

কারণ এই কেন্দ্রীভূত ঐশ্বর্য্য। কেবল তাহাই নহে। কেন্দ্রীভূত-ঐশ্বর্য্য ও ঘনীভূত-দরিদ্রের দ্বন্দ্বে ও মনোমালিন্যে কত শত জাতি উৎসন্ন গিয়াছে। তাই মহামায়া ঐ কেন্দ্রীভূত ঐশ্বর্য্যের পুনর্ব্বিস্তৃতির জন্য অন্নপূর্ণারূপে আবির্ভূতা না হইলে লক্ষ্মীর সেবকদিগের রক্ষার আর কোনও উপায় নাই। তজ্জন্য মৃত্যুকালে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারী আপনার উত্তরপুরুষদিগকে গভীর অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ধর্ম্মশালা, চতুষ্পাঠী ও মন্দির প্রতিষ্ঠাদি করিয়া অনুজ্ঞাদ্বারা আপনার পুত্রপৌত্রাদিকে ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্যবিস্তারিকেন্দ্রের সেবক মাত্র করিয়া যান। কৃষ্ণপান্তির মানসিক শক্তি প্রচুর। কিন্তু অশিক্ষিত মনে কি এত গভীর প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভব? কখনই না। লক্ষ্মী সরস্বতী ও অন্নপূর্ণা পূজার এ গভীর অর্থ পান্তির মনে উদয় হইয়া নীরস অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্য্যের সাহায্যে বিরাট জাতীয় দেহের কল্যাণ সাধনার্থে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। তাহার উপর অর্থাগমের

অদম্য প্রবাহের উন্মাদনী সুরা যে একবার প্রাণ ভরিয়া পান করিতে পাইয়াছে, সে কি বুঝে, যে, সে মাদকে উন্মত্ত? হয়ত দুই একবার পান্তির বিপুল উদার হৃদয়াকাশে ঐ মত্ততা পরিত্যাগের জন্য ঐশীবাণীর আরব উঠিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণপান্তির মোহ এ জীবনে ভাঙ্গিল না। সিন্ধুবক্ষে সুন্দর জলস্তম্ভের উদয় মধ্যে মধ্যে হয় বটে, কিন্তু তাহা কি স্থায়ী? কৃষ্ণপান্তির হৃদয়-সিন্ধুতে দারিদ্র বাতাঘাতে বিশাল মমতাস্তম্ভের উদয় হইয়া বহু-জনের দারিদ্র্যমোচন হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার মনে ঐ ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। মধুসূদনের মুখখানি প্রথমে দেখিয়াই তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে পান্তির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। আবার সেই ভাবের বশীভূত হইয়া মমতা-দীপ্ত হৃদয়ে মধু-সূদনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে শুভ সংবাদটী দিবার সময় তাঁহার অবস্থা আরও বিশদরূপে জানিয়া কৃষ্ণের হৃদয় অধিকতর মমতায় দ্রবীভূত হইয়া, তাঁহার মনোমধ্যে প্রশ্নের ঘুর্ণিবায়ু উঠিল। কিন্তু চিন্তামেঘ সংঘর্ষে অমার্জ্জিত হৃদয়াকাশে জ্ঞানের

বৈদ্যুতিক জ্যোতির উৎপত্তি হইল না। তিনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। তাঁহার মনের গুরুভার ঘুচিল না। তিনি অতি বিমর্ষচিত্তে আবাসে ফিরিলেন।

এদিকে মধুসূদন আগন্তুক ব্যক্তির শুশ্রূষায় জ্ঞানলাভের পর বাটী গমন করিয়া পরদিন প্রাতে পান্তির গদি হইতে আপনার প্রাপ্য অর্থ আনিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কৃষ্ণপান্তিরা বাল্যকালে গাংনাপুরের হাটে যাইলে যে সদাশয় ব্রাহ্মণ যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে পান্তাভাত প্রভৃতি খাওয়াইতেন, সেই ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ জমী-জমা বাকী-খাজনার দায়ে পান্তি-সরকারে এই সময়ে জপ্ত করা হয়। সে ব্রাহ্মণ আর ইহলোকে নাই। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া একদিন কৃষ্ণ সমীপে আবেদন করিলেন। কৃষ্ণপান্তি আবেদন শুনিয়া ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিতার নাম শুনিবামাত্র কৃষ্ণ যুবককে বলিলেন, "এস বাবা তুমি মোর সাতে এস, মুই সব ঠিক করি দিচ্ছি।"

এই বলিয়া যুবকসমভিব্যাহারে দপ্তর-খানায় প্রবেশ করিলেন। তথায় শম্ভু কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বড়কর্ত্তা প্রবেশ করিবামাত্র শম্ভু প্রভৃতি সকলে আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কৃষ্ণপান্তি কদাচিৎ দপ্তরখানায় প্রবেশ করিতেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণপান্তি ব্রাহ্মণকুমারের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া, ধিক্কার-সূচক স্বরে, "বলি শেম্ভো! ছেলেবেলায় এদের বাড়ীর পান্তাভাত, আর মুড়ীর মোয়া, সব ভুলে গিইচিস্? ধিক্ তোর!!" বলিয়া মস্তক আন্দোলিত করিয়া যেন ধিক্কারটা শম্ভুর প্রতি আয়ুধ নিক্ষেপ করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

সকলে ভয়ে ত্রস্ত; শম্ভুর মুখ পাণ্ডুবর্ণ! কৃষ্ণ চলিয়া গেলে, শম্ভু ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, "বোস ঠাকুর, বোস। তোমাদের সেই গাংনা-পুরেই বাড়ী? অমুকের ছেলে তুমি? এ কথা মোরে আগে বলনি কেন? মোরা ছেলেবেলায়

তোমাদের গাঁয়ে হাটে গেলে তোমার বাবা মা মোদের যত্ন কোরে পান্তাভাতটাত কত কি খাতি দিত।"

ব্রাহ্মণকুমার, "আজ্ঞে সে কথা আপনারাই জানেন। আমি তার কিছুই জানি না? আমার বাপ-মার অনেক দিন গঙ্গালাভ হয়েছে।"

শম্ভু, "তা বটে, তোমাকে দেখে মনে হয় তখন তুমি জন্মাও নি। তা দাওয়ানজি মোশাই, এদের জমী-জমা বাকি-খাজনার দায়ে জপ্ত করা হইছিল।—না হে ঠাকুর?"

ব্রাহ্মণকুমার, "আজ্ঞে হাঁ।"

শম্ভু দাওয়ানজিকে কহিলেন,"আপুনি খাজনাটা মাপ কোরে এদের জমী-জমাগুলি ছেড়ে দিন। আর দেখ্‌বেন এদের ওপর যেন আর কোন জুলুম না হয়। কত্তা তাহলি আর মোদের আস্ত রাখবা না। দেখলেন ত, আজ কি গরম হইছিলেন? তুমি যাও ঠাকুর, বাড়ী যাও। দাওয়ানজি মোশাই পেয়াদা পাঠিয়ে পরোয়ানা জারি কোরে দেবেন এখন।"

ব্রাহ্মণকুমার, "আজ্ঞে পরোয়ানাটী কবে

পাওয়া যাবে?

শম্ভু, "আজই ওবেলা যাবে। প্রণাম।" ব্রাহ্মণকুমার নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করিলেন।

বীরনগরের মহাদেব মুখোপাধ্যায়* কৃষ্ণের একজন প্রিয়বন্ধু। মহাদেবের যৎসামান্য ভূসম্পত্তি আছে; তাহাতেই তাঁহার কষ্টে দিনপাত হয়। মহাদেব বড় ভাল লোক; তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থোপার্জ্জনের উপায় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র ও মহাদেব বাল্যবন্ধু মহাদেব রন্ধনশিল্পে পারদর্শী ও মহা সৌখীন ব্যক্তি। কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম কলিকাতা যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান, এবং তদবধি মহাদেব প্রীতি প্রণয় বশতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদা থাকেন। দুই জনেই কলায়ের দাল বড়ই ভাল বাসিতেন। কখন কখন মহাদেব সখ করিয়া আপনি রাঁধিতেন। একদিন কলায়ের দাল এত উত্তম রাঁধিয়া দিলেন, যে কৃচষ্ণন্দ্র তাঁহার ক্ষমতার সুখ্যাতি করিতে হইলে সেই দিনের কলায়ের দালের উল্লেখ করিতেন।

* ইনি উলুর বিখ্যাত দাতা ৶ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব পুরুষ।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন নিজে অনেক জমীদারি করিলেন এবং বহু জনকে কত ছোট বড় তালুক ক্রয় করিয়া দিলেন, তখন একদিন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন, "পান্তি দাদা, আমার একটা ছোট খাট তালুক কিনে দেও। আমি তেমন বেশী টাকা দিতে পারব না। একটা ছোট খাট দিও, আমার কাচ্ছাবাচ্ছাদের একটা হিল্লে হবে।" কৃষ্ণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে একটী তালুক ক্রয় করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত আছেন। কিন্তু পছন্দমত তালুক পাওয়া যায় নাই বলিয়া ক্রয় করা হয় নাই।

কালেক্টারীর প্রতি নিলামের দিন কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত থাকেন; অভিপ্রায়, উত্তম জমী-দারি পাইলেই ক্রয় করা। উহা তাঁহার একরূপ নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পূজান্তে কৃষ্ণ ছাদের উপর মুক্তনীলাম্বরতলে বসিয়া পবিত্র বায়ু-সেবন ও কয়েকজন প্রিয় পারিষদের সহিত গল্প করেন। কখন বা কেহ পুরাণ পাঠ করেন, আর কর্ত্তা ভক্তিভাবে শ্রবণ করেন। সায়ংকালটা

এইরূপেই অতিবাহিত হয়। একদিন সন্ধ্যার পর এইরূপে সকলে গল্প করিতেছেন, এমন সময় পান্তি-কর্ত্তার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, কাল কালেক্‌টরীর নিলামে ভাল ভাল লাট আছে। কৃষ্ণ স্বীয় সেরেস্তা হইতে লোক প্রেরণ করিয়া মহাদেবকে ডাকাইয়া আনিলেন। মহাদেব আসিলে তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ, ভাই, কাল ভাল ভাল নাট নিলাম হবা। কাল পেরথম যে নাটটা ডাকবা সেডা তোমায় দিব।"

উক্ত তালুক গুলির তালিকা কালেক্টারী হইতে আনাইয়া কাহার কত আয়, কোনটীর পর কোনটী নিলাম হইবে, সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া মনস্থ করিলেন, যে প্রথম যেটী নিলাম হইবে সেইটীই মহাদেবকে ক্রয় করিয়া দিবেন।

নিলামের দিন প্রথম যে লাটটী কৃষ্ণ ক্রয় করিলেন তাহা মহাদেবের নামেই ডাকিয়া লইলেন। তাহার মূল্য প্রায় চারি লক্ষ টাকা। পান্তির পুত্রেরা আশ্চর্য্য হইল। তাহারাও সন্ধান পাইয়াছিল যে জমীদারিটী বৃহৎ, তাহাতে

উপস্থিত আয় যথেষ্ট নাই বটে, কিন্তু তাহার উন্নতিসাধন করিলে আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। "এমন উত্তম জমীদারিটী কত্তা কি না একটা বামুনকে দেবা? কিছুতেই তা হবা না, বড় কত্তাকে বলতি হবা। আরও ছোট ছোট অনেক লাট আছে, তার একটা মহাদেব মুখুয্যেকে কিনে দেন না কেন?" ইত্যাকার পরামর্শ করিয়া পুত্রগণ কৃষ্ণসকাশে নিজেদের আপত্তি জ্ঞাপন করিল। পুত্রদের যুক্তিতর্ক শুনিয়া পান্তি-কর্ত্তা কহিলেন, "তাকি হয় বাপু, মুই যে মুখুয্যের নামে কিনিচি, তারে দিব বলেই কিনিচি। আবার বামুনের নামেই ডেকিচি। এখন কি মুই তারে না দিয়ে মিথ্যেবাদী হবা, অধর্ম্ম করবা? তা হবা না মুই তোদের কথা শোনব না।" শেষ কথাটী ঈষৎ ঘৃণা ও বিরক্তি বিজড়িত দৃষ্টিতে বলিলেন। কৃষ্ণপান্তির সমস্ত কথা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে মোহিণীশক্তি সংযুক্ত হইয়া বাহির হইত, তাঁহার দৃষ্টিতেও তদ্রূপ তেজ মিশ্রিত থাকিত। এই দুই বস্তু একত্রে যাহার উপর প্রয়োগ করিতেন তাহার আর তাঁহার সহিত বিতণ্ডা

করিবার সাহস হইত না। পুত্রেরা তাঁহার নিকট আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ পাইয়াছিল, ইহাই যথেষ্ট, আর অধিক তর্ক প্রয়োগে তাহাদের সাহস হইল না।

পান্তিপুত্রদের আপত্তি শুনিয়া মহাদেব কৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন, "দেখ পান্তি দাদা, ও ভাল কথা হলো না। আমি ঐ অতবড় জমীদারি চাই নে। হয় তুমি ওটা নেও, নইলে তোমায় রোয়ে বোসে টাকা নিতে হবে। আমি ঐ জমীদারির উপস্বত্ব থেকেই তোমায় সুদ সমেত সব টাকা পরিশোধ করব।"

কৃষ্ণ, "আরে দাদা-ঠাকুর, তা কি হয়? মুই যে তোমারে দিব বোলি ছিলাম। দান কোরি কি টাকা কেউ লেয়?"

মহাদেব, "দেখ পান্তিদাদা, ঐটী সর্ব্বনেশে কথা। তোমায় আমায় পীরিতে সব করতে পারি। এক পাতে ভাত খেতে পারি। কিন্তু তোমার ছেলেদের বঞ্চিত কোরে, অত বড় বিষয় দান নিলে; পুরষোপুরুষি আমরা পতিত হোয়ে থাকব। জ্ঞাত কুটুমরা আমাদের একঘোরে করবে। তা তুমি

টাকা না নিয়ে কি আমার বংশটাকে হীন কোরে দিতে চাও, না আমি যে ভাল যুক্তি বলছি তাই কোরতে চাও?”

কৃষ্ণ, “না, দাদাঠাকুর, তোমার বংশকে পতিত করতি পারবা না। তবে একটা খরিদপত্তর লেখাপড়া কোরি লেও। ট্যাকাটা আর তোমায় দিতি হবা না।”

মহাদেব, “না ভাই, মিথ্যে ব্যাপারে আমি নেই। আমি টাকা দেব না, সে কথা ছাপা থাকবে না। সে অধর্ম্ম হবে। আমি তাতে রাজি নই। তা হোলে আমি ওবিষয় চাই নি ভাই?”

কৃষ্ণ, “আচ্ছা, আচ্ছা ঠাকুর, তুমি যা বলছ তাই হবা। কিন্তু ব্যাজের কথাটা যদি কও ত তোমার সাতি এই পয্যন্ত। মোর বংশে যদি কেউ তোমার কাছে সুদ লেয় ত মোর বংশির সব্বোনাশ হবা!”

মহাদেব এই প্রস্তাবে কোনও আপত্তি করিলেন না। তাঁহারা দাওয়ান রামচাঁদকে ডাকিয়া এই বন্দোবস্তের কথা জানাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রামচাঁদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেখ্ চাঁদা, এর তবে যদি একটা লেকা পড়া

কোরিস্, আর মোদের বংশির কেউ এই দাদা-ঠাকুরের কাছ থেকি সুদ লেয়, ত সে গোবক্ত খাবা; মুই এই দিব্বি দিলাম।”

শম্ভুর জ্যেষ্ঠপুত্র কহিল, “তা বেশ, জ্যেঠা মোশাই, তুমি যখন নিষেধ করছ, তখন মোরা সুদ কেন লিব? আর মুখুয্যে মোশার সাথি লেখা-পড়াই বা কেন করব? তা তুমি যা বল্‌লে, তাই হবা।”

কৃষ্ণচন্দ্র এই ঘটনার পর প্রায় সাত আট বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন, এবং মহাদেব তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে বৎসর বৎসর টাকা দিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

যেদিন কৃষ্ণ মহাদেবকে জমীদারি ক্রয় করিয়া দেন সেই দিনই স্বনামে অনেকগুলি জমীদারি ক্রয় করেন। তন্মধ্যে একটী বৃহত্তর জমীদারি ছিল। সেটী মেদনীপুর জেলার বিখ্যাত সুজামুটা জলামুটা পর্গণা; রাজা গোলকেন্দ্র নাথের পিতার সম্পত্তি। ইঁহারা পাঠান শাসনের প্রারম্ভ হইতে রাজা-উপাধি পাঠান শাসন-কর্ত্তাদের নিকট প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। রাজা স্বীয়স্বভাবদোষে আকণ্ঠ ঋণগ্রস্থ হইয়া

কালেক্টরীর কিস্তিখেলাপ করাতে তাঁহার জমীদারী নিলামে বিক্রয় হয়। লোক পরম্পরায় রাজা শুনিলেন কৃষ্ণপান্তি তাহা ক্রয় করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের উদারতার কথাও তিনি শুনিয়াছিলেন। রাজা ফকির হইলেও তথাপি রাজা। একদিন প্রভূাষে তিনি পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক লোকজন পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণপান্তির দ্বারস্থ হইলেন। কৃষ্ণপান্তি স্নানাহ্নিকের পর জলযোগ করিযা, অভ্যাসমত স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক প্রস্তুত করিয়া নিজগৃহে একপার্শ্বে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি রাজবেশধারী প্রৌঢ় সুপুরুষ শম্ভুর সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

শম্ভু জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে বলিলেন, "ইনিই কর্ত্তা মোশাই!" কৃষ্ণপান্তির আকৃতি দেখিয়া রাজার ত চক্ষুস্থির। কিন্তু আপনার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণকরিয়া স্বকর্ম্মসাধনের জন্য সসম্ভ্রমে একটী নমস্কার করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও সৌজন্য বশতঃ কৃষ্ণপান্তি

পূর্ব্বেই নতশিরে করযোড়ে নমস্কার করিয়াছেন। এখন একটী রৌপ্যমণ্ডিত হুঁকায় নিজের কলিকাটী বসাইয়া জোড়হস্তে রাজার সম্মুখে ধরিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বলিলেন, "বসতে আজ্ঞা হোক। মোদের বড়ই ভাগ্যি আজ মোশায়ের পায়ের ধূলো পড়ল। আপনকার হুকুম!"

রাজা হুঁকা হস্তে লইয়া তৎসমেত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আজ্ঞে আমি আপনার দ্বারস্থ! বিষয়-আশয় সবই গেছে। বসত বাড়ীটী পর্য্যন্ত ঐ একলাটে মশাই খরিদ করেছেন। আমার সর্ব্বস্ব যখন আপনার হোল আমিও তখন আপনার। আমিও আপনার সংসার-ভুক্ত না হয়ে যাই কোথা? তাই মশায়ের দয়ার সংসার-ভুক্ত হতে এসেচি, মশাই এখন আমার প্রতি উপযুক্ত আদেশ করুন, এই আমার প্রার্থনা।" ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে রাজার নেত্রে অশ্রু দেখা দিল।

অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার সুন্দর বদনোপরি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মার্জ্জিত ভাষা শ্রবণ করিতে করিতে কৃষ্ণপান্তির নয়নেও অশ্রুর আবির্ভাব হইল। রাজার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে

পাণ্ডি বস্ত্রপ্রান্তে মুখাবৃত করিয়া গদগদ স্বরে অবনত মস্তকে কহিলেন, "মুই বড়ই অপরাধ করিচি, আপুনি আজা, আপনকার বিষয় খরিদ করি মুই বড়ই কুকম্ম করচি। আপুনি মোরে ক্ষ্যামা কর। মুই পায়ে ধোরে ক্ষ্যামা চাইচি।" এই কথা বলিয়া নত হইয়া রাজার পাদধারণ করিতে উদ্যত হইলেন।

রাজা, "সে কি কথা, সে কি কথা", বলিতে বলিতে দুই তিন পদ পিছাইয়া গেলেন। কৃষ্ণপাণ্ডি আবেগসম্বরণ ও নেত্র মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "মোশায়ের সমস্ত বিষয় নেকা পড়া কোরে ফিরিয়ে দিচ্ছি। মোশাই ইচ্ছেমত নেকা পড়া কোরে লেও! বসতি আজ্ঞা হয়।" তৎপরে সোজা ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ওজস্বী স্বরে শম্ভুকে কহিলেন, "শেম্ভো, যা এখুনি কাগোজ কলুম লিয়ে আয়; আজা মোশাই যেমন হুকুম করবা তেমনি নিকে পড়ে দে," বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া শম্ভুকে এবং তৎসঙ্গে অন্য সকলকেই প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলেই প্রস্থান করিলেন।

রাজা চৌকীর উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মশাই, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।"

কৃষ্ণপান্তি, "যেআজ্ঞে," বলিয়া একপ্রান্তে সসম্ভ্রমে উপবেশন করিলেন।

রাজা, "আপনি কত টাকায় ডেকেছেন? মহাশয়ের খরচই বা কত হচ্ছে, আর আমাকেই বা কি দিতে হবে? আমি ত দেনায় ডুবে আছি।"

কৃষ্ণ, "আজ্ঞে, মোশয়কে কিছুই দিতি হবা না। মুই এক কড়া কড়িও দিতি পারবা না। আর লিলেমের ট্যাকায়ও মোশায়ের দেনা সব শোধ হয়েছে। আপনকার নামেও শুনলাম কত হাজার ট্যাকা আমানতও আছে। আপুনি সেটাও বার করি লেবে। নারাণের কাছে পেরাথনা করি মোশাই যেন এবার একটু সোমজে চলো।"

এইবার রাজার নেত্র হইতে বেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। রুমালে মুখ আবৃত করিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে ভগ্নস্বরে বলিলেন; "আপনি দেবতা! আপনিই ঠিক

রাজা! আমি অপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করব। ছেলেকে সমস্ত বিষয় দিয়ে কাশী-বাসী হব! আর না!! বুদ্ধি-দোষে কতই না হল। মা জগদম্বা আপনাকে কৃপা করুণ! আর না, মশাই আর না; আমার ঘাট হয়েছে; আর না, এবার বিশ্বনাথের আশ্রয়ে গিয়ে বাকী কটাদিন কাটিয়ে দেব!!” কথাগুলি গদগদ ভাবে বলিয়া চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া স্থিরভাবে বসিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় বয়স ও দুরবস্থার প্রভাবে কুঞ্চিত হওয়াতে শতদল হইতে পতিত পত্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। রাজা পুনরায় কহিলেন, “আপনাকে কেমন কোরে ধন্যবাদ দেব, তা বুঝে উঠতে পারছিনি। তবে আমার একটা কথা আপনাকে শুনতে হবে। যে টাকা আপনার খরচ হয়েছে, সেই টাকাটী আপনাকে নিতে হবে। সেটী না নিলে বিষয় ফিরিয়ে নিতে আমি প্রস্তুত নই। সব গেছে তা কি হবে? দোরে দোরে ভিক্ষে করব, তাও ভাল, তবু অমনি বিষয়টী ফিরিয়ে নিতে পারব না। আপনিও সেটা ভেবে দেখুন, বংশে একটা মহা কলঙ্ক থেকে

যাবে। হাজার হোগ্, তারা রাজার ছেলে, সবাই বলবে আমার পুত্র পৌত্রেরা আপনার ভিক্ষান্ন-ভোজী; বাপ পিতামহের নাম ডুব্‌বে। আর এক কথা, আমি নিজের খরচ পত্তর যদি সমস্ত কমিয়ে দি, তবে চার পাঁচ লক্ষ টাকা আট দশ বৎসরে, না হয় পনেরো বৎসরে পরিশোধ হোয়ে যাবে।”

মহাদেব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই প্রস্তাব শুনিয়া কহিলেন, “দেখ পান্তি দাদা, তুমি এতে আপত্তি কোর না। ওঁরা রাজা, তোমার দান নেবেন কেন? তোমার আমার সঙ্গে যেমন বন্দোবস্ত হয়েছে সেই রকম বন্দোবস্ত কোরে রাজা মশাইকে বিষয় ফিরিয়ে দেও। বিষয় কিনলে আজকের দিনে কে ফিরিয়ে দেয়, ভাই? তুমি যে ফিরিয়ে দিচ্ছ, এমন পরম উপকার রাজার বংশের লোকেরা চিরকাল মানবেন। এই ঢের, তা তুমি আর আপত্তি কোর না।”

কৃষ্ণচন্দ্র সকল কার্য্য যদি নিজের ইচ্ছামত করিতে পারিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তিনি এক তিল বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন

না। লোকের দুঃখে তাঁহার মনোমধ্যে যে প্রথম আবেগ উঠিত তাহাতেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও দারিদ্র্যমোচনে প্রবৃত্ত হইতেন। মহাদেবের যুক্তি এবং রাজার প্রতিজ্ঞা, বিনামূল্যে সম্পত্তি ফিরিয়া লইবেন না শুনিয়া, অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, "তবে মুই রাজি হলাম। কিন্তু দাদাঠাকুর, দেখ, যেন সুদের কথা নেকা পড়া না হয়। সুদ মুই লিতি পারবা না।"

রাজা একটু হাসিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, সুদটা দিতে হলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করা হয় না। আর আমিও সেটা দিতে হোলে সম্পত্তিটী উদ্ধার করতে পারব না।"

বৃদ্ধ রাজার রূপ ও স্বভাবের সম্বন্ধ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণপান্তির মনে হইল, "হয়ত রাজার আহার হয় নাই।" অমনি জোড়হস্তে "আপোনকার এখনো ত সেবা হয় নি? অনেক বেলাও ত হয়েছে," বলিয়া একজন ভৃত্যকে রাজার ও তাঁহার সহচরদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

রাজার মনে একবার গর্ব্বিত প্রতিবাদের উদয় হইল। কিন্তু তাঁহার মনের অবস্থা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। তাঁহার অভিমানমহীরুহ অদ্যকার প্রবল ঝড়ে উৎপাটিতপ্রায়। তাহাতে যে দুই একটী শাখা বিদ্যমান সে গুলিও রাজা স্বহস্তে ক্রমাগত অনুতাপকুঠারাঘাতে কর্ত্তন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সৌজন্য বিবেচনায় একবার মাত্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আমার সঙ্গে লোকজন আছে, তারা যা হয় করবে এখন। মশাই আর কোন কষ্ট করবেন না।"

কৃষ্ণপান্তি ঈষৎ হাস্য বদনে বলিলেন, "সে কি মোশাই, আজ আপুনি মোর অতিথি। মুই অতিথি সেবা করব না, তা কি হয়?"

রাজা, "যে আজ্ঞে, আপনি আবার কষ্ট করবেন?"

কৃষ্ণ, "কষ্ট কিছু মোশাই? মুই ত আর আঁধব না; আঁধলেও ত আপুনি তা খাবেন না।"

রাজা প্রফুল্ল চিত্তে হা হা রবে হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি ওসব মানিনি।

আপনি যে মহাত্মা লোক, আবার এখন আমার অন্নদাতা ;” তাঁহার স্বর পুনরায় বদ্ধ হইয়া আসিল।

কৃষ্ণপান্তি করজোড়ে বলিলেন, “আজ্ঞে তা তো নয়। ট্যাকা কড়ি বিষয় সমস্ত নারাণের, মুই ভাণ্ডারী মাত্তর। মুই মোশায়কে দিতি পেরিছি এই ভাগ্যি।” এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি সুখ সম্ভোগের নূতন ক্ষেত্র চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন। নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল।

ইতিমধ্যে শম্ভু দাওয়ানজী মুহুরী প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া মহাদেবের আদেশ মত ষ্ট্যাম্প্ কাগজে দলিল লেখা পড়া করিলেন রাজার সাক্ষাতে পান্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। কর্ম্মচারিদের অনুরোধে শেষদশায় কৃষ্ণপান্তি লেখা পড়ার চরম আপনার নামটীমাত্র লিখিতে শিখিয়াছেন।

রাজা আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে কৃষ্ণপান্তিকে ও শম্ভুকে

আলিঙ্গন করিয়া বহুমূল্য বস্ত্র অঙ্গুরীয় প্রভৃতি নানা বস্তু পান্তির পারিপার্শ্বিকবর্গকে পুরস্কার এবং নিজের গললম্বিত মতির মালাটী দাওয়ানজীর গলায় পরাইয়া দিয়া হস্তী আরোহণে প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণের জন্ম ১১৫৫ সালে, এখন তাঁহার বয়স ছাপ্পান্ন বৎসরেরও অধিক। কৃষ্ণ ও. শম্ভুর পুত্রেরা এখন উপযুক্ত। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং মহা উপার্জ্জনক্ষম, সুতরাং অর্থব্যয়ে তিলমাত্রও কুণ্ঠিত হন না। যখনি লোকের অভাব দেখিয়াছেন তখনি মুক্তহস্তে অর্থদ্বারা তাহার অভাব-মোচন করিয়াছেন; কত লোককে ভূসম্পত্তি কিনিয়া দিয়াছেন। পান্তিপুত্রেরা স্বয়ং উপার্জ্জন কখনও করে নাই। তাহারা ঐশ্বর্য্যে লালিত পালিত, সুতরাং ঐশ্বর্য্য রক্ষা না করিতে পারিলে অন্য জীবনোপায় নাই, ইহাই তাহাদের মজ্জাগত বিশ্বাস। কৃষ্ণচন্দ্র অপর্য্যাপ্ত খরচ করেন, তাহাতে তাহাদের হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয়। প্রাগুক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে তাহারা পরামর্শ করিল যে বিষয় ভাগ করিয়া লইলে কৃষ্ণচন্দ্র আর তেমন অতিরিক্ত খরচ

করিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিতে পারিবেন না। কৃষ্ণচন্দ্র আপন পুত্র অপেক্ষা শম্ভুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভালবাসেন, এবং তাহার কথা বেশী শুনেন। এইজন্য শম্ভুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভ্রাতাদের মুখপত্র হইয়া সম্পত্তিবিভাগের প্রস্তাব কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট উত্থাপিত করিলে, কৃষ্ণ তাহাতে নির্বিরোধে সম্মত হইলেন। ১২১২ সালে কৃষ্ণ শম্ভু ও রামনিধি মধ্যে সম্পত্তি বিভক্ত হইল। রামনিধি আজন্ম মহাব্যাধিগ্রস্ত তজ্জন্য কথন কোনও বিষয়কর্ম্মে সহায়তা করিতে পারেন নাই বলিয়া, অন্য দুই ভ্রাতার তুল্যাংশ সম্পত্তি পাইলেন না। তাঁহাকে কেবল লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়া, বাকী সম্পত্তি কৃষ্ণ ও শম্ভুচন্দ্র সমানাংশ করিয়া লইলেন। হাট-খোলার গদিতে শম্ভুর অংশের আয়ব্যয় পর্য্যবেক্ষণের জন্য তৎপক্ষীয় একজন গদিয়ান নিযুক্ত হইল। রামচাঁদ পূর্ব্ববৎ শম্ভুর সাহায্যে উভয় পক্ষের জমীদারির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইলে, একদিন শম্ভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত সমীপে আসিয়া কহিল, "বলি, জ্যাঠা মোশাই, তোমরা ত বেশ!

ভাই ভাই বিষয় ভাগ করি লিলে; মোরে কিছুই দিলে না। মুই কি কেউ নই? মুই খাবা কি?"

কৃষ্ণচন্দ্র অমনি কহিলেন, "সত্যি ত! তা তোদের দুই ভাইকে হল্‌দা পর্গণা আর ডিহি-ছাওাটা পান খাতি দিলাম।" এই বলিয়া তখনি আপন অংশ হইতে দুইটী সুবৃহৎ জমীদারি শম্ভুর দুই পুত্রের নামে লিখিয়া দিলেন। এই দুই জমীদারির বাৎসরিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বর ইহাতে অতিশয় মনক্ষুণ্ণ হইয়া পিতাকে কহিল, "বাবা তুমি ওদের দুলক্ষি ট্যাকার তালুক বেশী দেলে, মোদের বিষয় তাতি কত কমে গেল।"

কৃষ্ণ, "ওরে, ভয় কি! তুই দেখনা, মুই আবার রোজগার করি তোদের কত বেশী করি দিব।" তিনি তাহাই করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে ততোধিক সম্পত্তি সঞ্চয় করিলেন।

পরিশিষ্ট ।

সম্পত্তি বিভাগের প্রায় চারি বৎসর পরে, ১২১৬ সালে একদিন কৃষ্ণচন্দ্র শুনিলেন মেদিনীপুরের সুজামুটা পর্গণার রাজা সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনার্থ কাশীধামে বাস করিতেছেন। এত বিলাসিতা পরিত্যাগে রাজাকে সমর্থ দেখিয়া ও তাঁহার পূর্ব্বের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া কৃষ্ণপান্তির মনে বিষম অনুতাপ জন্মিল। বিষয় ক্রয় করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি দিবানিশা মনে করেন, "এত তালুক কিনে ত কত মানুষের অন্ন কেড়ে নিয়েচি।" প্রাণে একটা মহা ধিক্কার উঠিল; ক্রমে তাহা যন্ত্রণায় পরিণত হইল। কোন কাজেই আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ আস্থা নাই; কিছুতেই আর উৎসাহ নাই। "মহামায়ার ভাণ্ডারী হয়ে ত কেবল নিজেদেরই পেট ভরিয়েছি; মুই মা অন্নপূর্ণার কাছে কি নেমখারামীই করিচি! বিশ্বাস কোরে মা তুমি মোর হাতে অতুল ইশ্ব্যয্যি দিইছ, তা ত কয় ভায়ে বেঁটে লিইছি, আর নোক দেখান দু দশ

জনাকে· কিছু দিইচি।” কৃষ্ণপান্তির মনে ঐরূপ ধিক্কার উঠিয়া একবার সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, পর মুহূর্ত্তেই আবার সন্তান সন্ততির মায়ায় সে ইচ্ছা কোথায় ভাসিয়া যায়। কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধবাদী চিন্তার অবিশ্রান্ত ঘোরতর দ্বন্দ্বে কৃষ্ণপান্তির শরীর শীঘ্র অক্ষম হইয়া পড়িল। কৃষ্ণপান্তি সদাই বিমর্ষ ও চিন্তামগ্ন। তাঁহার আর আহারে রুচি নাই। দুই তিন মাসের মধ্যে তাঁহার শরীরও ভগ্নদশাগ্রস্ত হইল। কৃষ্ণের হৃদয়ের অনুতাপানল শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; তাঁহার মনোমধ্যে আবার নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহার যাবতীয় শক্তি-নিচয় একমাত্র ছার অর্থোপার্জ্জনেই অপচিত না করিয়া যদি তিনি তাহার অধিকাংশ ঈশ্বরোপলব্ধির পথে লাগাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনুষ্যজীবন ধন্য হইত; ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি সারাজীবন কেবল বিষয় সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার আরও মনে হইল যে তাঁহাতে ও একজন দস্যুতে বিশেষ প্রভেদ নাই। দস্যু রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে সমাজ তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, কিন্তু

সমাজের প্রচলিত উপায়ে শক্তিমান পুরুষ অর্থ উপার্জ্জন ও তাহা কেবল আপনার নিমিত্ত সঞ্চিত করিলে, ঐশ্বর্য্যের অযথা বৈষম্যে জনসমাজের যে ভীষণ অনিষ্ট ঘটে, অন্নের অভাবে কত শত শত ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাণনাশ হয়, কত শত সৎসংসারের দৈন্য ঘটে, এ দস্যুর হস্ত হইতে সমাজের রক্ষা নাই! শৃগাল কুক্কুর, বানর প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট প্রাণী যেমন নিজ জঠরাগ্নির পরিতৃপ্তিতেই সমস্ত জীবশক্তি ব্যয় করিয়া হীনজীবন অতিবাহিত করে, এমন কি কখন কখন সেই হুতাশনে আপনার সন্তানগণকেও আহুতিপ্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, এত প্রবল মানসিক শক্তির সহায়ে তিনি স্বয়ং যে সেই মহা হীন পথাবলম্বনে অপরের মুখের অন্ন নিজ-গৃহে সঞ্চয় করিয়া সারা জীবনটা অতিবাহিত করিয়াছেন তাহাও তাঁহার মনে হইল। তাঁহার জীবনভার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি একবার ভাবিলেন সন্তানগণের জন্য অতি সামান্য রাখিয়া অন্ততঃ নিজ সম্পত্তি সদাব্রত ও দেবসেবায় প্রদান করিবেন। কিন্তু তাহা মায়াহেতু কার্য্যে পরিণত

করিতে পারিলেন না। দিবানিশা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন ও নারায়ণের নামোচ্চারণ করেন। অশান্তির মাত্রা পলে অনুপলে বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার আরত্রিকের সময় ঠাকুরঘরে যাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র একপার্শ্বে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ ও ধ্যান করেন। আজ শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি ঠাকুরঘরে যাইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। গৃহদেবতার সান্ধ্য আরত্রিক শেষ হইল, পান্তি তখনও বসিয়া জপ করিতেছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ঠাকুরঘরের আলোক সকল নির্ব্বাণোন্মুখ, শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত, গাত্রে অতিশয় বেদনা; কৃষ্ণপান্তি জপমালা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিতে চেষ্টা করিলেন, মস্তক ঝনঝন করিয়া উঠিল; কোন প্রকারে ঈষৎ নত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামের পর আসন পরিত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে দেয়াল ধরিয়া বাহিরে আসিলেন, মাথা ঘুরিয়া গেল, বসিয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার উঠিয়া স্বগৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। মস্তকের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল

আহারের সময় শম্ভু আসিয়া বলিলেন, "দাদা, ঠাঁই হইছে, ভাত খাবে এস।"

কৃষ্ণপান্তি অতীব গ্লানিযুক্ত স্বরে উত্তর করিলেন; "মোর শরীরটা ভাল লেই। মাথাটা বড় ধরল; ক্ষিদে লেই, আজ কিছু খাব না; তোরা খাগা।"

শম্ভু প্রস্থান করিলেন; মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল, "দাদার আজকাল শরীর অসুস্থ, মনও ভাল না। আজ আবার পষ্ট অসুখ করল দেখচি," শম্ভু ইত্যাকার চিন্তামগ্ন। ক্রমে কৃষ্ণের মস্তকের যন্ত্রণা অত্যন্ত বাড়িতে লাগিল; কষ্ট-সহিষ্ণু কৃষ্ণপান্তি একটীও উঃ আঃ শব্দ করিলেন না। ক্রমে যন্ত্রণায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন; লোকে জানিল বড় কর্ত্তা নিদ্রিত।

আহারান্তে শম্ভু একবার আসিয়া দেখিলেন, দাদা নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া আছেন, "একটু ঘুমুলে মাথা ছেড়ে যাবে," মনে করিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে আর একবার আসিয়া দেখিলেন, দাদা তদ্রূপ; কেবলমাত্র ঈষৎ প্রবল বেগে নিশ্বাস বহিতেছে, গাত্রস্পর্শ করিয়া

দেখিলেন উত্তপ্ত, জ্বর হইয়াছে। শম্ভু একজন ভৃত্যকে চুপি চুপি বলিলেন; "তুই শব্দ করিস্‌নি; আস্তে আস্তে এইখানেই আমার বিছানাটা কোরে দে; আর তুই দালানে শুয়ে থাকিস্‌, সজাগ থাকবি। দাদার জ্বর হয়েছে; আজ আমি এই খানেই শোব। যদি দাদার কোন রকম সাড়া পাস্‌ ত আমায় জাগিয়ে দিবি। বুঝলি?"

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে আদেশ পালন করিল। শম্ভু সেই গৃহে শয়ন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া দাদার গাত্রস্পর্শ করিয়া দেখিলেন, ভয়ানক উত্তাপ। কবিরাজ আনয়ন করা হইল। কবিরাজ আসিয়া সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "বিকার! বড় কর্ত্তা বুঝি এ যাত্রা আর রক্ষা পান না!"

কবিরাজের কথা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে তীরস্থ করিবার পরামর্শ স্থির করিলেন। যে জাহ্নবী তীরে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া মুনিঋষি মনীষীগণ বেদগান ও ধ্যান-ধারণা করিয়া তৎ-সংশ্লিষ্ট প্রদেশ ও আকাশকে ধর্ম্মচিন্তায় অনুকম্পিত

করিয়া গিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন, সেই নিত্যপ্রবাহিত ধর্ম্মানুকম্পনে একবার মাত্র অনুবদ্ধ হইতে পারিলে, ধর্ম্মজীবনের সহায়তা করিয়া ধর্ম্মলাভার্থীগণকে অদ্যাপি অতি সহজে পরমার্থলাভ করাইয়া থাকে, সেই জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনী জাহ্নবী ও চূর্ণির সঙ্গম-স্থল ঐ পান্তিদের বাটীর অতি সন্নিকট। সুরধনীর সেই সংযোগস্থানে পল্লীবাসী ও নিজেদের স্নানাদি সৎকর্ম্মের জন্য পান্তিকর্ত্তা বহু পূর্ব্বেই একটী আটচালা নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অমূল্য জীবনের শেষ কয়েক দিন সেই মহাপবিত্র স্থলে অতিবাহিত হইল। সকলে অতি সন্তর্পনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় সুরধনীতটে লইয়া ঐ চৈত্যে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই পুণ্যতোয়ার বাতাসে কৃষ্ণচন্দ্র সংজ্ঞা-লাভ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কোনও কালে বিষয়ী লোক ছিলেন না। আত্ম পরিতৃপ্তির জন্য বিষয়বাসনা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। সংজ্ঞালাভের পর তিনি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় সকলের সহিত সহজ কথা কহিতে লাগিলেন। সে কথায় বিষয়বাসনার লেশমাত্র

নাই, সে কথা কেবলমাত্র মহামায়ার চিন্তাপূর্ণ। একবার মাত্র তাঁহার স্মরণ হইল বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তাঁহার নিজস্ব কারবারী গদি আছে। অমনি সেই সমস্ত গদি গদিয়ানদিগকে নিজ নিজ গদির মূলধনসহ দান করিলেন; আর তাহাতেই যেন তাঁহার সমস্ত বিষয়-বাসনার পরিতৃপ্তি জন্মিল। তৃতীয় দিবসে কবি-রাজ ও নাড়ীজ্ঞ প্রাচীন প্রতিবাসীগণ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কৃষ্ণচন্দ্রের নাড়ী অনুভব করিয়া কহিলেন, "আর বিলম্ব নাই।" বাটীব সকলেরই আহার হইয়াছে, উপস্থিত প্রতিবেশীদেরও আহার হইয়াছে; এই সংবাদ লইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রাণের বন্ধু মহাদেবের এখনও আহার হয় নাই শুনিয়া চুপি চুপি তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাদেব অসম্মত হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বুঝিলেন যে এ ক্ষেত্রে বহুবিধ লোক উপস্থিত, এস্থলে আহার করায় তাঁহার সামাজিক আপত্তি, সুতরাং তিনি আর অনুরোধ করিলেন না। জপমালা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তেই সর্ব্বক্ষণ ছিল, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণবায়ু

দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব-মহাপ্রাণে মিশাইল, কৃষ্ণপান্তির ভবলীলা শেষ হইল।

সমাপ্ত

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
১	১৬	ষড়	বড়
২	১৪	পুত্রের	পুত্রের
১২	১০	বিক্রুপের	বিদ্রূপের
১৩	১৭	করনান্তর	করণান্তর
১৪	১৬	আছ	আছে
১৯	১৬	বধু	বধূ
২২	১৫	যাঁহারা	যাঁহাদের
২৪	১৪	মোক	নোক
৩১	৮	শম্ভূ	শম্ভু
ঐ	২০	বর্ষণ	বর্ষিত
ঐ	ঐ	লালিল	লাগিল
৩২	৬	রানাঘাট	রাণাঘাট
ঐ	ঐ	চুর্ণিতে	চূর্ণিতে
৩৩	৮	পাইয়া	

ঐ	২০	ভবিষ্যত	ভবিষ্যৎ
৩৫	৭	আমদানি	আমদানী
৩৬	১২	মহাজনি	মহাজনী
ঐ	১৩	তেজারতি	তেজারতী
৩৭	১৫	কেষ্ঠ	কেষ্ট
৩৮	১৮	পয়সায়	পায়সান্ন
৩৯	১	কুজ্ঝটিকা	কুজ্ঝটিকা
ঐ	১৯	প্রণটার	প্রাণটার
৪১	১৬	উচিৎ	উচিত
৪৯	১৮	নিস্তব্দ	নিস্তব্ধ
৫২	৪	ঐ	ঐ
৫৪	৭	ঐ	ঐ
৫৬	৫	ব্যবসায়িদিগের	ব্যবসায়ীদিগের
৬১	১৮	ওষ্টাধর	ওষ্ঠাধর
৬৩	১৫	গাম্ভীর্য্যের	গাম্ভীর্য্যের
৬৪	১৫	বেচব কত্তা	বেচব, কত্তা
৬৮	৬	বিপদগ্রস্থ	বিপদগ্রস্ত
৬৯	২	মশাই	মশাইরা
৭৮	১৬	ধুম	ধূম
৯৪	২	দ্রুতগামিস্রোতে	দ্রুতগামী স্রোতে

ঐ	৪	ষষ্ঠির	ষষ্ঠীর
ঐ	৯	ঐ	ঐ
৯৬	৫	সত্বর	সত্ত্বর
১০৭	১৫	গললগ্নকৃতবাসে	গললগ্নীকৃতবাসে
১২৫	২০	বানিজ্য-ক্ষেত্রে	বাণিজ্য-ক্ষেত্রে
১৩২	৯	আরোহন	আরোহণ
ঐ	৪	দক্ষিণা	দক্ষিণ
ঐ	৬	দুর্ব্বাদল	দূর্ব্বাদল
ঐ	৮	অস্তমুখি দিনমনির	অস্তমুখ দিনমণির
ঐ	১৬	দিনমনির	দিনমণির
১৩৪	১	কর্ম্মচারীগণ	কর্ম্মচারিগণ
১৩৫	১৯	মুর্ত্তিগুলো	মূর্ত্তিগুলো
১৪৪	২	গ্রহণ	গ্রহণ
১৪৫	৪	আধারষ্ট	অধরোষ্ঠ
১৪৬	৭	কিরদ্দূর	কিয়দ্দূর
১৫২	৯	নেয্য	ন্যায্য
ঐ	৮	সত্তর	সত্ত্বর
১৬৬	৫	অসম্যত	অসম্মত
১৭০	১৯	উদ্বেলিত	উদ্বেল

১৮৭	৩	জোড়হস্তে	যোড়হস্তে
২০৩	১১	প্রত্যূষে	প্রত্যূষে